প্রথম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক, ১৩৫১

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম
২২+৩১=১৫. ১১. ৪৪

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত অগণিত চিঠিপত্র প্রাচুর্যের দিক দিয়া রবীন্দ্র-রচনার একটি প্রধান অংশ; কবির মানসলোকের অনেক মহলের রহস্যকুঞ্চিকা এই চিঠিপত্রের মধ্যেই গোপন আছে, এবং রবীন্দ্রজীবনীসৌধ গঠনের অনেক উপকরণ এই পত্রধারার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই চিঠিপত্রের যতটা অংশ এ-পর্যন্ত গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ আছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ এই-সকল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া চিঠিপত্র নামে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে, কবির জীবিতকালে, ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথ ও পথের প্রান্তে নামে তিনখণ্ড পত্রসংগ্রহ তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; রচয়িতার চিরন্তন অধিকারবলে তিনি এই-সকল গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রের বহু-স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। চিঠিপত্র নামে এখন যে-সকল পত্রসংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে তাহাতে একান্ত অন্তরঙ্গ বা অবান্তর কোনো অংশ ভিন্ন পরিবর্জনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না, এবং পাঠের কোনো পরিবর্তন করিব না; বর্জিত অংশ যথারীতি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার মূল চিঠির বানান ও ক্ষুদ্রতম চিহ্নাদি পর্যন্ত অবিকল রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠি যথেষ্টসংখ্যক থাকিলে, পত্রে উল্লিখিত বা অনুমিত কালানুক্রমে সেগুলি একখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডে, সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির ছত্রিশ খানি চিঠি মুদ্রিত হইল। পত্নীর মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) পর এই কয়খানি চিঠি কবির লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল, ও এতদিন সেগুলি

তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সহধর্মিণীকে লিখিত কবির আর কোনো চিঠি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সম্ভবত রক্ষিতও হয় নাই।

মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহাও গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল। কবিকে লিখিত তাঁহার কোনো চিঠি আমাদের সন্ধানগোচর হয় নাই।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ডের সম্পাদনায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশবিভাগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আগামী খণ্ডগুলির সম্পাদনায়ও তাঁহার আনুকূল্য পাইব, এই আশা করি এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

শ্রীনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

দেখিলাম খান-কয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা কটি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি' রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবি চন্দ্র তারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি ক'রে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে।
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ।

—স্মরণ



ওঁ

ভাই ছোটবউ

যেম্‌নি গাল দিয়েছি অম্‌নি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমানুষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অম্‌নি নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন আর দুটো গাল-মন্দ দিলেই একেবারে জল। এ'কেই ত বলে বাঙ্গাল। ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা! আজ এতক্ষণ এক দল লোক উপস্থিত ছিল— তোমাদের চিঠি যখন এল তখন খুব কথাবার্ত্তা চল্‌চে চিঠিও খুল্‌তে পারিনে, উঠ্‌তেও পারিনে। একদল উকীল আর স্কুলের মাষ্টার এসেছিল। আমার বই স্কুলে চালাবার জন্য কথাবার্ত্তা কয়ে রেখেছি কেবল বই আর পাচ্চিনে। কই, আজও ত বই এসে পৌঁছল না। ভাল গেরোতেই ফেলেছ! রাজর্ষি যে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়েছি। নদিদির গল্পসল্পও দিয়েছি। আবার ইন্‌স্পেক্টরের গলা ভেঙ্গে গেছে বলে তাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধও দিয়েছি— এতে অনেক ফল হতে পারে— তার গলা ভাঙ্গা না সারলেও তবু মনটা প্রসন্ন থাক্‌বে। দেখ্‌চ, বসে বসে কত উপার্জ্জনের উপায় করচি! সকালে উঠেই বই লিখতে বসেছি তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ! ছাপাবার সমস্ত খরচ না উঠুক্ নিদেন দশ পঁচিশ টাকাও উঠ্‌বে। এইরকম উঠে পড়ে লাগ্‌লে তবে টাকা হয়! তোমরা ত কেবল খরচ কর্ত্তে জান— এক পয়সা

ঘরে আন্‌তে পার? কুঞ্জ লিখেছে জিনিষপত্র বিরাহিমপুরে পাঠিয়েছে সেখানে থেকে বোধ হয় কাল এখানে এসে পৌঁছতে পারে। আমাদের সাহেব আস্‌বেন পর্শু দিন। সেদিন আমার কি শুভদিন। আমার কি আনন্দ! আমার সাহেব আস্‌বে আবার আমার মেমও আস্‌বে হয়ত আমার ঘরে এসে খানা খেয়ে যাবে— নয়ত বল্‌বে— বাবু, আমার সময় নেই! আমার কত ভাগ্যি! প্রার্থনা করি, যেন তার সময় না থাকে। কিন্তু খাবার নাম শুনলে যে সময়ের অভাব হবে এমন ত আমার আশা হয় না!— বেলি খোকার জন্যে এক একবার মনটা ভারি অস্থির বোধ হয়। বেলিকে আমার নাম করে দুটো "অড" খেতে দিয়ো। আমি না থাক্‌লে সে বেচারা ত নানা রকম জিনিষ খেতে পায় না। খোকাকেও কোনো রকম করে মনে করিয়ে দিয়ো। আমার পশমের ছবি দেখে সে আমাকে চিন্‌তে পারে এ শুনে আমি বড় খুসি হলুম না।...

[সাহাজাদপুর
জানুয়ারি, ১৮৯০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২]

ওঁ

ভাই ছোট বৌ

আজ আমরা এডেন্ বলে এক জায়গায় পৌঁছব। অনেক দিন পরে ডাঙ্গা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে নাব্‌তে

পারব না, পাছে সেখান থেকে কোন রকম ছোঁয়াচে ব্যামো নিয়ে আসি। এডেনে পৌঁছে আর একটা জাহাজে বদল করতে হবে, সেই একটা মহা হাঙ্গাম রয়েছে। এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কি বল্‌ব— তিন দিন ধরে যা' একটু কিছু মুখে দিয়েছি অমনি তখনি বমি করে ফেলেচি— মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির— বিছানা ছেড়ে উঠিনি — কি করে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধ্‌টু আদর করলুম আর বল্লুম ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম— বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কি না। তার পরে বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়ে ছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছট্‌ফট্‌ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই— এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়বনা। আজ এক হপ্তা বাদে প্রথম স্নান করেছি। কিন্তু স্নান করে কোন সুখ নেই— সমুদ্রের নোনা জলে নেয়ে সমস্ত গা চট্‌চট্‌ করে— মাথার চুল গুলো একরকম বিশ্রি আটা হয়ে জটা পাকিয়ে যায়— গা কেমন করে। মনে করচি যতদিন

না জাহাজ ছাড়ব আর স্নান করব না। ইউরোপে পৌঁছতে এখনো হপ্তাখানেক আছে— একবার সেইখানে পৌঁছে ডাঙ্গায় পা দিলে বাঁচি। এই দিন রাত্রি সমুদ্র আর ভাল লাগে না। আজকাল যদিও সমুদ্রটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, জাহাজ তেমন তুল্‌চে না, শরীরেও কোন অসুখ নেই— সমস্ত দিন জাহাজের ছাতের উপরে একটা মস্ত কেদারার উপরে পড়ে, হয় লোকেনের সঙ্গে গল্প করি, নয় ভাবি, নয় বই পড়ি। রাত্তিরেও ছাতের উপরে বিছানা করে শুই, পারৎপক্ষে ঘরের ভিতরে ঢুকিনে। ঘরের মধ্যে গেলেই গা কেমন করে ওঠে। কাল রাত্তিরে আবার হঠাৎ খুব বৃষ্টি এল— যেখানে বৃষ্টির ছাঁট নেই সেইখানে বিছানাটা টেনে নিয়ে যেতে হল। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত ক্রমাগতই বৃষ্টি চল্‌চে। কাল বেড়ে রোদ্দুর ছিল। আমাদের জাহাজে দুটো তিনটে ছোট ছোট মেয়ে আছে— তাদের মা মরে গেছে, বাপের সঙ্গে বিলেত যাচ্চে। বেচারাদের দেখে আমার বড় মায়া করে। তাদের বাপটা সর্বদা তাদের কাছে কাছে নিয়ে বেড়াচ্চে— ভাল করে কাপড় চোপড় পরাতে পারেনা, জানে না কি রকম করে কি করতে হয়। তারা বৃষ্টিতে বেড়াচ্চে, বাপ এসে বারণ করলে, তারা বল্লে আমাদের বৃষ্টিতে বেড়াতে বেশ লাগে— বাপটা একটু হাসে, বেশ আমোদে খেলা করচে দেখে বারণ করতে বোধ [হয়] মন সরে না। তাদের দেখে আমার নিজের বাচ্ছাদের মনে পড়ে। কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম— সে যেন ষ্টীমারে এসেচে— তাকে এমনি চমৎকার

ভাল দেখাচ্ছে সে আর কি বলব— দেশে ফেরবার সময় বাচ্ছাদেব জন্যে কি রকম জিনিষ নিয়ে যাব বল দেখি। এ চিঠিটা পেয়েই যদি একটা উত্তর দাও তা হলে বোধ হয় ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তে পেতেও পারি। মনে রেখো মঙ্গলবার দিন বিলেতে চিঠি পাঠাবার দিন। বাচ্ছাদের আমার হয়ে অনেক হামি দিয়ো— ...

"শ্যাম", শুক্রবাব
[২৯ অগস্ট, ১৮৯০]

শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩]

ওঁ

ভাই ছোট গিন্নি

পর্শু তোমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি— আজ আবার আর একটা লিখ্‌ছি— বোধ হয় এ দুটো চিঠি এক দিনেই পাবে— তাতে ক্ষতি কি? কাল আমরা ডাঙ্গায় পৌঁছব— তাই আজ তোমাকে লিখে বাখ্‌চি। আবার সেই ইংলণ্ডে পৌঁছে তোমাদের লেখবার সময় পাব। যদি যাতায়াতেব গোলমালে এর পরের হপ্তায় চিঠি ফাঁক যায় তা হলে কিছু মনে কোবোনা। জাহাজে চিঠি লেখা বিশেষ শক্ত নয়— কিন্তু ডাঙ্গায় উঠে যখন ঘুরে বেড়াব, কখন্ কোথায় থাক্‌ব তার ঠিকানা নেই— তখন দুই একটা চিঠি বাদ যেতেও পারে। আমরা, ধরতে গেলে পর্শু থেকে য়ুরোপে পৌঁচেছি। মাঝে মাঝে দূর থেকে য়ুরোপের ডাঙ্গা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আমাদের জাহাজটা এখন্ ডান দিকে গ্রীস্ আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে। দ্বীপটা খুব কাছে দেখাচ্চে— কতকগুলো পাহাড়, তার মাঝে মাঝে বাড়ি, এক জায়গায় খুব একটা মস্ত সহর— দূরবীন দিয়ে তার বাড়িগুলো বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম— সমুদ্রের ঠিক ধারেই নীল পাহাড়ের কোলের মধ্যে শাদা সহরটি বেশ দেখাচ্চে। তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচেনা ছুট্‌কি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আস্‌তে হবে তা জান? তা মনে করে তোমার খুসি হয় না? যা কখনো স্বপ্নেও মনে কর নি সেই সমস্ত দেখ্‌তে পাবে। দুদিন থেকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ে আস্‌চে— খুব বেশি নয়— কিন্তু যখন ডেকে বসে থাকি, এবং জোরে বাতাস দেয় তখন একটু শীত-শীত করে। অল্পস্বল্প গরম কাপড় পরতে আরম্ভ করেছি। আজকাল রাত্তিরে "ডেকে" শোওয়াটাও ছেড়ে দিতে হয়েচে। জাহাজের ছাতে শুয়ে লোকেনের দাঁতের গোড়া ফুলে ভারি অস্থির করে তুলেছিল। আমরা যে সময়ে এসেছি নিতান্ত অল্প শীত পাব— দার্জিলিঙ্গে যেরকম শীত ছিল তার চেয়ে ঢের কম। ছাড়বাব সময়-সময় একটু শীত হবে হয়ত। আমি অনেকগুলো অদরকারী কাপড় চোপড় এবং সেই বালাপোষখানা মেজবোঠানের হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি— সেগুলো পেয়েছ ত? না পেয়ে থাক ত চেয়ে নিয়ো। সেগুলো একবার লক্ষ্মীর হাতে পড়লে সমস্ত মেজবোঠানের আলমারির মধ্যে প্রবেশ করবে। বেলির জন্যে আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজবোঠানদের

সঙ্গে পাঠিয়েছি— সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ— খুব টুক্‌টুকে লাল কাপড়— বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে— পাড়টাও বেশ নতুন রকমের— না ? মেজবোঠানও বেলির জন্যে তার একটা প্রাইজের কাপড় নিয়েচেন— নীলেতে শাদাতে— সেটাও বেলুরাণুকে বেশ মানাবে। সেটা যে রকমের ভাবুনে, নতুন কাপড় পেয়ে বোধহয় খুব খুসী হয়েচে। আমাকে কি সে মনে করবে ? খোকাকে ফিরে গিয়ে কি রকম দেখ্‌ব কে জানে। ততদিনে সে বোধ হয় দুটো চারটে কথা কইতে পারবে। আমাকে নিশ্চয় চিন্‌তে পারবে না। হয়ত এমন ঘোর সাহেব হয়ে আস্‌ব তোমরাই চিন্‌তে পারবে না। আমার সেই আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল এখন সেরে গেছে— কিন্তু খুব দুটো গর্ত্ত হয়ে আছে— ভয়ানক কেটে গিয়েছিল। অনেক দিন বাদে কাল পর্শু দুদিন স্নান করেচি— আবার পর্শুদিন প্যারিসে পৌঁছে নাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেখেনে টার্কিষ্ বাথ্ বলে একরকম নাবার বন্দোবস্ত আছে তাতে খুব করে পরিষ্কার হওয়া যায়— বোধ হয় আমার "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে" তার বিষয় পড়েচ— যদি সময় পাই ত সেইখেনে নেয়ে নেব মনে করছি। আমার শরীর এখন বেশ ভাল আছে— জাহাজে তিন বেলা যেরকম খাওয়া চলে তাতে বোধ হচ্চে আমি একটু মোটা হয়ে উঠেচি। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটা-সোটা সুস্থ দেখ্‌তে পাই ছোটবউ। গাড়িটা ত এখন্ তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে— রোজ নিয়মিত বেড়াতে

যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না। কাল রাত্তিরে আমাদের জাহাজের ছাতের উপর ষ্টেজ্ খাটিয়ে একটা অভিনয়ের মত হয়ে গেছে— নানা রকমের মজার কাণ্ড করেছিল— একটা মেয়ে বেড়ে নেচেছিল। তাই কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ জাহাজে শেষ রাত্তির কাটাব।··

[৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০] রবি

[৪]

ওঁ

ভাই ছোট বৌ— আমরা ইফেল টাউয়ার বলে খুব একটা উঁচু লৌহস্তম্ভের উপর উঠে তোমাকে একটা চিঠি পাঠালুম। আজ ভোরে প্যারিসে এসেচি। লণ্ডনে গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত। ছেলেদের জন্যে হামি।

৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯০
প্যারিস

[৫]

ওঁ

ভাই ছোটবউ

আজ আমি কালিগ্রামে এসে পৌঁছলুম। তিনদিন লাগ্‌ল। অনেক রকম জায়গার মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। প্রথমে বড় নদী— তার পরে ছোট নদী, দুধারে গাছপালা,

চমৎকার দেখ্‌তে,— তারপরে নদী ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসে, নিতান্ত খালের মত, দুধারে উঁচু পাড়, ভারি বদ্ধ ঠেকে। তার পরে একজায়গায় ভয়ানক তোড়ে জল বেরিয়ে আস্‌চে ২০।২৫ লোকে ধরে আমাদের নৌকো টেনে নিয়ে এল। একটা মস্ত বিল আছে তার নাম চলন বিল। সেই বিলের থেকে জল নদীতে এসে পড়্‌চে। তারপরে ঠেলে ঠুলে অনেক কষ্টে এবং অনেক বিপদ এড়িয়ে বিলের মধ্যে এসে পড়লুম— চারদিকে জল ধূ ধূ করচে, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ঘাস জমি— একটা মস্ত মাঠে বর্ষার জল দাঁড়ালে যে রকম হয়— মাঝে মাঝে বোট মাটিতে ঠেকে যায়, প্রায় একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে ঠেলাঠুলি করে তবে তাকে জলে ভাসাতে পারে।— ভয়ানক মশা। মোদ্দা কথাটা, এই বিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। তারপরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী, মাঝে মাঝে বিল। এমনি করে ত এসে পৌঁচেছি। আবার এই রাস্তা দিয়ে যে বিরাহিমপুরে যেতে হবে সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্চে না। এখানকার নদীতে একেবারেই স্রোত নেই। শেওলা ভাস্‌চে, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে— পাড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় যথেষ্ট মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব। আমার মিষ্টি বেলুরাণুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে— তার ত ঐ একটুখানি মন, তার আবার কি হবে? তাকে বোলো

আমি তার জন্যে অনেক "অড্" আর জ্যাম্ নিয়ে যাব। কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি— তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লাগ্‌চে। সে কি এখন কথাবার্ত্তা বল্‌তে আরম্ভ করেছে— আমার ত মনে হচ্চে বেলা ওর বয়সে বিস্তর বোলচাল বের করেছিল। তোমাদের ওখেনে শীত নেই? আমাকে ত শীতে ভারি কাঁপিয়ে তুলেছে। কেবল কাল রাত্তিরে কোন্ একটা বদ্ধ জায়গায় নৌকো রেখেছিল, আর সমস্ত পর্দ্দা ফেলেছিল— তাই গরমে জেগে উঠেছিলুম—তার উপরে আবার কানের কাছে একদল লোক সেই একটা দুটো রাত্তিরে গান জুড়ে দিলে "কত নিদ্রা দিবে আর উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে!" প্রাণপ্রিয়ে যদি কাছাকাছির মধ্যে থাক্‌ত তা হলে বোধ হয় চেলা কাঠের বাড়ি পিটোত। মাঝিরা তাদের ধম্‌কে থামিয়ে দিলে, কিন্তু আমার মাথায় ক্রমাগতই ঐ লাইনটা ঘুরতে লাগ্‌ল "উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে"— মাথার মধ্যে অসুখ কর্ত্তে লাগ্‌ল— শেষকালে পর্দ্দা উঠিয়ে জান্‌লা খুলে শেষ রাত্তিরে একটুখানি ঘুমোতে পাই। তাই আজ কেবল ঘুম পাচ্চে।...তোমার ভাই কলকাতায় এসে কি রকম আছে। তার পড়াশুনোর কি কিছু ঠিক কর্‌চ? মাসকাবারী কমাসের বেরোলো? আমি হয় ত দিন পনেরো বাদে এখান থেকে যেতে পারব— এখনো বল্‌তে পারিনে।

[কালিগ্রাম
ডিসেম্বর, ১৮৯০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ সকালে এ অঞ্চলের একজন প্রধান গণৎকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সমস্ত সকাল বেলাটা সে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে— বেশ গুছিয়ে লিখ্‌তে বসেছিলুম বকে বকে আমাকে কিছুতেই লিখ্‌তে দিলে না। আমার রাশি এবং লগ্ন শুনে কি গুণে বল্লে জান? আমি সুবেশী, সুরূপ, রংটা শাদায় মেশানো শ্যামবর্ণ, খুব ফুটফুটে গৌর বর্ণ নয়।— আশ্চর্য্য! কি করে গুণে বল্‌তে পারলে বল দেখি? তার পরে বল্লে আমার সঞ্চয়ী বুদ্ধি আছে কিন্তু আমি সঞ্চয় করতে পারব না— খরচ অজস্র করব কিন্তু কৃপণতার অপবাদ হবে— মেজাজটা কিছু রাগী (এটা বোধ হয় আমার তখনকার মুখের ভাবখানা দেখে বলেছিল)। আমার ভার্য্যাটি বেশ ভাল। আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে— আমি যাদের উপকার করব তারাই আমার অপকার করবে। ষাট বাষট্টি বৎসরের বেশি বাঁচব না। যদিবা কোন মতে সে বয়স কাটাতে পারি তবু সত্তর কিছুতেই পেরতে পারব না। শুনে ত আমার ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই ত সব ব্যাপার। যা হোক তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছু না হোক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আমার সংসর্গ পেতে পারবে। ততদিনে সম্পূর্ণ বিরক্ত ধরে না গেলে বাঁচি। আমার ঠিকুজিটা সঙ্গে থাকলে তাকে দেখানো যেতে পারত। সেটা

আবার প্রিয়বাবুর কাছে আছে। সে বল্লে বর্ত্তমানে আমার ভাল সময় চল্‌চে— বৃহস্পতির দশা— ফাল্গুন মাসে রাহুর দশা পড়বে। ভাল অবস্থা কাকে বলে তাত ঠিক বুঝতে পারিনে।

[সাহাজাদপুর, ১৮৯১] রবি

[৭]

ওঁ

ভাই ছুটি

আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘেত্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোন রকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখ্‌চি অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আস্‌চে। প্রতি মাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূর্ব্বে থেকে তোমার সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তোমার ভোলার মা আজকাল যখন শয্যাগত তখন এ ঘি বোধ হয় অনেক লোকের উপকারে লাগ্‌চে। ভালই ত। একটা সুবিধা, ভাল ঘি চুরি করে খেয়ে চাকরগুলোর অসুখ করবে না। আমার আম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এবারে মনে হল যেন দু জাতের আম ছিল, একরকমের আম খুব ভাল ছিল— অন্যটাও মন্দ নয় কিন্তু তেমন ভাল না। দুটো একটা

পচেও গেছে। যাহোক ঠিক একটি হপ্তা ত চলে গেল। আমার আহার দেখে এখানকার লোকে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। আমি ভাত খাইনে শুনে এরা মনে করে যেন আমি অনাহারে তপস্যা করচি। আটার রুটি যে ভাতের চতুর্গুণ খাদ্য তা এদের কিছুতেই ধারণা হয় না। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেই একবার করে আমার আহারের কথা তুলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করে যায়। সাহাজাদ-পুরময় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ভাত ছেড়ে দিয়েছি বলে সবাই আমাকে ভারি ধার্মিক মনে করে— আমার কুষ্টিতে লেখা আছে কি না যে বিনা চেষ্টায় আমার যশ এবং আর দুই একটা জিনিস হবে।

[সাহাজাদপুর, ১৮৯১] রবি

[৮]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার প্রবাস ঠিক এক মাস হল। আমি দেখেছি যদি কাজের ভীড় থাকে তা হলে আমি কোন মতে একমাস কাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি। তার পর থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।— কাল সন্ধের সময় এখানে বেশ একটু রীতিমত ঝড়ের মত হয়ে গেছে। বাতাসের গর্জ্জনে অনেকক্ষণ ঘুমোতে দেয়নি। তোমাদের ওখানেও বোধ হয় এ ঝড়টা হয়ে গেছে। কাল দিনের বেলাও খুব বৃষ্টি হয়ে

গেছে। নদীর জলও অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। শস্যের ক্ষেত সমস্তই জলে ডুবে গেছে— জল আর একফুট বাড়লেই আমাদের বাগানের কাছে আসে। যেদিকে চেয়ে দেখি খানিকটা ডাঙ্গা খানিকটা জল। মেয়েরা আপনার বাড়ির সামনের জলেই বাসন মাজা এবং অন্যান্য নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করচে। সভ্যতার অনুরোধে শরীর যতখানি কাপড়ে আবৃত থাকা উচিত তার চেয়েও আঙুল চার পাঁচ উপরে কাপড় তুলে মেয়ে পুরুষ সকলেই রাস্তা দিয়ে চলেচে। গর্ম্মিকালে এখানে যেমন জলকষ্ট, বর্ষাকালে ঠিক তার উল্টো। আমাদের তেতালা-তেও বোধ হয় বৃষ্টি হলে কতকটা এই রকমের দৃশ্যই দেখা যায়। বারান্দায় যে পরিমাণে জল দাঁড়ায় তাতে বোধ হয় অনায়াসে চৌকাঠের কাছে বসে স্নান বাসন-মাজা প্রভৃতি চলে যায়। বর্ষাকালে যদি এই উপায় অবলম্বন কর তাহলে তোমার অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে যায়। আজকাল তুমি দু-বেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্চ কি না আমাকে বল দেখি। এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্চে কি না, তাও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিব্যি আরামে নভেল পড়চ। তোমার যে মাথা ধরত এখন কি রকম আছে?

[সাহাজাদপুর, ১৮৯১] রবি

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আহারান্তে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছি তারপরেও আবার খানিকক্ষণ ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে গড়াতে গড়াতে সাধনার কাজ করেছি। তারপরে যখন এখানকার প্রধান কর্ম্মচারীরা বড় বড় কাগজের তাড়া নিয়ে এসে প্রণাম করে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন তখন আমার ঘুমের ঘোর আমার সুখের স্বপন একেবারে ছুটে গেল। একবার মনে মনে ভাবলুম, যদি এদের মধ্যে কেউ হঠাৎ সুর করে গেয়ে ওঠে—

"ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!"

তা হলে ও গানটা বোধ হয় মায়ার খেলার দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে একেবারে উঠিয়ে দিই। কিন্তু সে রকম সুর করে গান গাবার ভাব কারো দেখ্‌লুম না। দুই এক জনের একটু খানি কাঁদুনির সুর ছিল কিন্তু তাদের বক্তব্য বিষয়টা ঘুমের ঘোর প্রেমের ডোর নিয়ে নয়— তারা বেতন বৃদ্ধি চায়। তাদের অনেকগুলি ছেলেপুলে, হজুরের শ্রীচরণ ছাড়া তাদের আর কোনো ভরসা নেই, হজুর তাদের মাতা এবং পিতা। এ ছাড়া কতকগুলি সাবেক ইজারাদারের নামে বাকি খাজনার ডিগ্রি করা হয়েচে তারা সুদ খরচা মাপ নিয়ে কিস্তিবন্দী করে টাকা দিতে চায় এবং তাদের দেনার

মধ্যে যে সমস্ত ওজর আছে তারও একটা সদ্বিচার প্রার্থনা করে। এর মধ্যে করুণরস এবং অশ্রুজল যথেষ্ট আছে, অনেকে হয় ত বাড়ি ঘর দোর নিলেম করে সর্বস্বান্ত হতে বসেছে কিন্তু এতে সুর বসিয়ে অপেরা হবার যো নেই— কিন্তু নলিন নয়নের কোণে একটুখানি ছল্‌ছল্‌ করে আসুক দেখি অমনি কবির কবিতা গাইয়ের গান বাজিয়ের বাজনা সমস্ত ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌বে, অমনি দর্শক শ্রোতা এবং পাঠকের বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভেসে যাবে! এম্‌নি এই সংসার! সমুদ্রতীর এবং সমুদ্রতরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখ্‌চি তখন আর কাঠা বিঘের জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র অনন্ত তীর চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট বাঙ্গ্‌লা বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়র কন্ট্রাক্টর এষ্টিমেট্‌ চিন্তা পরামর্শ ধার এবং টোয়েল্‌ভ্‌ পার্সেণ্ট্‌ সুদ— তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয় না, লোক্‌সান বোধ হয়—স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠ্‌ল না দেখ্‌চি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক। এই রকম নানা চিন্তা করচি এবং খালের মধ্যে দিয়ে বোট টেনে নিয়ে যাচ্চে— আকাশে ঘননীল মেঘ করেচে— ভিজে বাদ্‌লার বাতাস দিয়েছে, সূর্য্য প্রায় অস্তমিত— পিঠে একখানি শাল চাপিয়ে যোড়াসাঁকোর ছাত আমার সেই দুটো লম্বা কেদারা এবং সাঁৎলাভাজার কথা

এক একবার মনে করচি। সাঁৎলা ভাজা চুলোয় যাক্ রাত্রে রীতিমত আহার জুটলে বাঁচি। গোফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটা ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কি একটা রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত আছে মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় চিড়বিড় শব্দ হচ্চে— এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আস্‌চে কিন্তু এক পস্‌লা বৃষ্টি এলেই সমস্ত মাটি।..

রবি

[১৮৯২]

শুক্রবার

[১০]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ যদি বিবাহিমপুরের পেস্কার সেখানকার ফটিক মজুমদারের মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল বক্তৃতায় আমাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলেচে বিবৃত করে একখানি চিঠি না লিখ্‌ত তা হলে ডাকে আমার একখানিও চিঠি আস্‌ত না এবং আমি এতক্ষণ বসে বসে ভাবতুম আজ এখনো ডাক এল না বুঝি। তোমাদের মত এত অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি। পাছে তোমাদের চিঠি পেতে এক দিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি লিখেচি। কিন্তু আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না। এ রকম করে চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়—

এতে তোমাদের মনেও একটুখানি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় না। তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখ্‌তে তা হলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশঃ বিশ্বাস হয়ে আস্‌চে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু ছত্র চিঠি লিখ্‌তে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখ্‌লে তুমি হয়ত একটুখানি খুসি হবে এবং না লিখ্‌লে হয়ত চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান্ জানেন। বোধ হয় ওটা একটা অহঙ্কার। কিন্তু এ গর্ব্বটুকু আর ত রাখতে পারলুম না। এখন থেকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাক্। আজ সন্ধে বেলায় শ্রান্ত শরীরে বসে বসে এই রকম লিখ্‌লুম, আবার হয়ত কাল দিনের বেলায় অনুতাপ হবে, মনে হবে পৃথিবীতে পরের কাজ নিয়ে পরকে ভর্ৎসনা করার চেয়ে নিজের কাজ নিজে করে যাওয়াই ভাল। কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই পরের ত্রুটি নিয়ে খিটিমিটি করা আমার স্বভাব এবং তোমার অদৃষ্টক্রমে তোমাকে চিরজীবন এটা সহ্য করতে হবে। ভর্ৎসনাটা প্রায় চেঁচিয়ে করি আর অনুতাপটা মনে মনে করি, কেউ শুন্‌তে পায় না।

[শিলাইদহ] রবি

ওঁ

ভাই ছুটি

এখানে কাল থেকে কেমন একটু ঝোড়ো রকমের হয়ে আস্‌চে— এলোমেলো বাতাস বচ্চে, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়চে, খুব মেঘ করে রয়েচে। গণৎকার যে বলেচে ২৭ জুন অর্থাৎ কাল একটা প্রলয় ঝড় হবার কথা, সেটা মনে একটু একটু বিশ্বাস হচ্চে। আমার ইচ্ছে করচে কালকের দিনটা তোমরা তেতালা থেকে নেবে এসে দোতলায় হলের ঘরে যাপন কর— কিন্তু আমার এ চিঠিটা তোমরা পশু পাবে— যদি সত্যিই কাল ঝড় হয় আমার এ পরামর্শ কোন কাজে লাগ্‌বে না। তেমন ঝড়ের উপক্রম দেখ্‌লে তোমরা কি আপনিই বুদ্ধি করে নীচে আস্‌বে না? যা হোক্, দৈবের উপর নির্ভর করে থাকা যাক্। তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই— বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। একলা বসে বসে সঙ্কল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব— অবিচলিত ভাবে আপনার কর্ত্তব্য করে যাব— তার পরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না— কতদূর কৃতকার্য হতে পারব জানিনে। প্রতিদিন নিরলস হয়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি

নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পায় না— যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ করে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে— সেটা যে কিছুই নয় এই রকম ভাব্‌তে চেষ্টা করা উচিত— তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব— যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরেব মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আব কোন উপায় নেই।— আমিও মনে কবেছিলুম শিলাইদহের বাড়ি করবার ভার নীতুর উপর দেব। এবারে ফিবে গিয়ে তার একটা স্থির করা যাবে। তোমার বইয়ের লিষ্টের মধ্যে যতদূর মনে পড়চে দুখানা বই কম দেখ্‌চি— রামমোহন রায় এবং মন্ত্রী অভিষেক— প্রথমটা সমাজে পাওয়া যায় দ্বিতীয়টা তেতালাতেই পাবে। পদ-রত্নাবলীও দিতে পার।

রবি

[সাহাজাদপুর

রবিবার

২৬ জুন, ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর একটু হলেই ডুবেছিল। আজ সকালে পান্টি থেকে পাল তুলে আস্‌ছিলুম— গোরাই ব্রিজের নীচে এসে আমাদের বোটের মাস্তুল ব্রিজে আট্‌কে গেল— সে ভয়ানক ব্যাপার— একদিকে স্রোতে বোটকে ঠেল্‌চে আর এক দিকে মাস্তুল ব্রিজে বেধে গেছে— মড়্‌মড়্‌ মড়্‌মড়্‌ শব্দে মাস্তুল হেল্‌তে লাগ্‌ল একটা মহা সর্বনাশ হবার উপক্রম হল এমন সময় একটা খেয়া নৌকো এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল এবং বোটের কাছি নিয়ে দুজন মাল্লা জলে ঝাঁপিয়ে সাঁৎরে ডাঙ্গায় গিয়ে টান্‌তে লাগ্‌ল— ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক সেই সময় উপস্থিত ছিল তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচবার কোন উপায় ছিল না— ব্রিজের নীচে জলের তোড় খুব ভায়ানক— জানিনে, আমি সাঁৎরে উঠতে পারতুম কি না কিন্তু বোট নিশ্চয় ডুব্‌ত। এ যাত্রায় দু তিনবার এই রকম বিপদ ঘট্‌ল। পান্টিতে যেতে একবার বটগাছে বোটের মাস্তুল বেধে গিয়েছিল সেও কতকটা এই রকম বিপদ— কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তুল্‌তে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মারা গিয়েছিল।—মাঝিরা বল্‌চে এবার অযাত্রা হয়েছে।— খুব ঘন মেঘ করে এসেচে— সমস্ত নদী তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে—

সুন্দর দেখতে হয়েচে— কিন্তু দেখ্‌বার সময় নেই— দুপুর বাজে— এইবেলা নাইতে যাই। বর্ষাকালে নদীতে ভ্রমণ না করলে নদীর শোভা দেখা যায় না— কিন্তু বর্ষাকালে জলে বেড়ানো প্রায় ঘটে ওঠে না। এবারে ত হল।— যাই নাইতে যাই।

[শিলাইদহ,
২০ জুলাই, ১৮৯২]

রবি

[১৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালোই হয়েচে, নইলে কলকাতায় ফিরতে আমার মন যেত না, এবং কলকাতায় ফিরেও আমার অসহ্য বোধ হত। তা ছাড়া আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, সেইজন্যে তোমাদের কাছে পাবার জন্যে আমার প্রায়ই মনে মনে ইচ্ছে করত। কিন্তু আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাক্‌বে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধ্‌রে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আস্‌বে এই রকম আমি খুব আশা করে ছিলুম। যাই হোক্‌ সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়! যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের

কর্ত্তব্য করে যেতে হবে— তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোট বৌ— ওতে মন্দ বই ভাল হয় না। প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে অথচ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে— আমি নিজে ভারি অসন্তুষ্ট স্বভাব, সেই জন্যে আমি অনেক অনর্থক কষ্ট পাই— কিন্তু তোমাদের মনে অনেকখানি প্রফুল্লতা থাকা ভারি আবশ্যক। নইলে সংসার বড় অন্ধকার হয়ে আসে। যা চেষ্টা করবার তা যত দূব সাধ্য করব— কিন্তু তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান ত ভাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমাব নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জ্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না— তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটা দূর করে দিয়ো, কিন্তু তুমি আবার তাতে যোগ দিয়ো না। যদি তোমরা ইতিমধ্যে ছেড়ে থাকো তা হলে ত এবার কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে— চেষ্টা করব উড়িষ্যায় যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সে জায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর। আমি বাবামশায়কে আমার ইচ্ছে কতকটা জানিয়ে রেখেচি তিনিও কতকটা বুঝেচেন— আর দুই একবার বল্লে কিছু ফল হতেও পারে—কিন্তু আগে থাকতে বেশি আশা করে বসা কিছু না। আমার মনে হচ্চে হতে করতে এ চিঠিটাও তুমি সোলাপুর অঞ্চলে পাবে। আজ যাব কাল যাব করে নির্দ্দিষ্ট দিনের পরেও নিদেন তোমাদের দিন আষ্টেক দশ কেটে

যাবে। দেখা যাক্। সমস্ত দিন বোট চল্‌চে— সন্ধে হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ত পাবনায় পৌঁছলুম না। সেখানে গিয়ে আবার ক্রোশ দেড়েক পাল্কীতে করে যেতে হবে।

[শিলাইদহ, রবি
নদীপথে ১৮৯২] সোমবার

[১৪]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ডিকিন্সনদের বাড়ি থেকে আবার তাগিদ দিয়ে আমার কাছে এক একশো বিরাশি টাকার বিল এবং চিঠি এসেছে। আবার আমাকে সত্যর শরণাপন্ন হতে হল। তা হলে তার কাছে আমার ন শো টাকার ধার থাক্‌ল। সে কি তোমাকে চার শো টাকা দিয়েছে? আমাকে ত এখনো সে সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি। আজকের বিবির চিঠিতে তোমাদের কতকটা বিবরণ পেলুম। সে লিখেছে তোমরা প্রায়ই সেখানে যাও— এবং আমার ক্ষুদ্রতম কন্যাটি মেজবোঠানের কোলে পড়ে পড়ে নানা বিধ অঙ্গভঙ্গী এবং অস্ফুট কলধ্বনি প্রকাশ করে থাকে। তাকে আমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আমি যদি আষাঢ় মাস মফস্বলে কাটিয়ে যাই তা হলে ততদিনে তার অনেক পরিবর্ত্তন এবং অনেক রকম নতুন বিদ্যে শিক্ষা হবে। বেলির সঙ্গে খোকা কি গান শিখ্‌চে না? তার গলা কি রকম ফুট্‌চে? কেবল সা রে

গা মা না শিখিয়ে তার সঙ্গে একটা কিছু গান ধরানো ভাল— তা হলে ওদের শিখ্‌তে ভাল লাগ্‌বে— নইলে ক্রমেই বিরক্ত ধরে যাবে। মনে আছে ছেলেবেলায় যখন বিষ্ণুর কাছে গান শিখ্‌তুম তখন সা রে গা মা শিখ্‌তে ভারি বিরক্ত বোধ হত। যে দিন সে নতুন কোন গান শেখানো ধরাত সেই দিন ভারি খুসি হতুম। তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধতে আরম্ভ করে দাও না— তার পরে বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামী স্ত্রীতে দুজনে মিলে বাদ্‌লায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে। কি বল! বিদ্যেভূষণ আজকাল তোমার কাজকর্ম কি রকম কর্‌চে? ইদানীং তাকে ধম্‌কে দেওয়ায় পর কি তার স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে— বেচারার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দিন পরে সম্মিলন হয়েছে সেটা মনে রেখো— তোমার মার খবর কি?

[শিলাইদহ, ১৮৯৩] রবি

[১৫]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এগারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরতে হবে। আজ রাত্তির পথের মধ্যে একটা ডাক বাঙ্গলায় কাটাতে হবে, তারপরে কাল বোধ হয় সন্ধের মধ্যে পুরীতে গিয়ে পৌঁছতে

পারব। Mrs. Gupta এবং তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাচ্ছেন, সে জন্যে তাঁদের বিস্তর জিনিষ পত্র বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেচে। বিহারী বাবু ত নানা রকম বন্দোবস্ত করতে করতে এই তিনচার দিন একেবারে ক্ষেপে যাবার যো হয়েছেন। Mrs. Gupta ভারি নিরুপায় গোছের মেয়ে— তিনি কিছুই গুছিয়ে গাছিয়ে করেকর্মে নিতে পারেন না— তিনি বেশ ঠাণ্ডা হয়ে চুপচাপ করে বসে থাকেন— বলেন, আমি পারিনে, আমার মাথায় কিছু আসে না। বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখ্‌লুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই যে ক দিনের জন্যে পুরীতে যাচ্চেন, মানুষ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে হলেও এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেনা। কেবল তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্‌ করেন না— সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্ত ভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধ হয় পৃথিবীতে অতি দুর্ল্ভ। বিহারী বাবু ভারি গৃহস্থ প্রকৃতির লোক— ছেলে পুলেদের খুব ভালোবাসেন, আমার দেখ্‌তে বেশ লাগে। আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মত— খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়— আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুসী তাই করতে সময় পাই। যে যত্নটুকু করেন বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে। কিচ্ছু বাড়াবাড়ি নেই। এমনকি বলুকেও অনেকটা বাগিয়ে

আন্‌তে পেরেচেন— সে বেচারা যদিও এখনো ক্রমাগত মাথা নীচু করে লজ্জায় লাল হয়ে হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ত একরকম বন্ধ করেচে। ওঁরা যা খেতে বলেন তাতেই মাথা নাড়ে। ভাগ্যি ওঁরা দুজনে মিলে অনেক পীড়াপীড়ী করেন তাই মুখে দুটি অন্ন ওঠে। নইলে এতদিনে শুকিয়ে যেত। পথের মধ্যে যদি দুদিন চিঠি লিখ্‌তে না পারি ত কিছু ভেবো না, এবং এ কথা মনে রেখো যে কটক থেকে যত দিনে চিঠি পাও পুরী থেকে তার চেয়ে আরো দুদিন দেরি হয়— সে আরো দূরে। তা হলে তিন চারদিন চিঠি না পেতেও পার—

রবি

[কটক হতে পুরীর পথে
ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩]

[১৬]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ ঢাকা থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। আমি তাহলে একবার শীঘ্র কালিগ্রামের কাজ সেরে কলকাতায় গিয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত করে আসব। কিন্তু ভাই, তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্ত স্থির সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা কর। এই একমাত্র চেষ্টা আমি সর্ব্বদাই মনে বহন করি এবং জীবনে পরিণত করবার সাধনা করি। সব সময় সিদ্ধিলাভ করতে

পারিনে— কিন্তু তোমরাও যদি মনের এই শান্তিটি রক্ষা করতে পারতে তাহলে বোধ হয় পরস্পরের চেষ্টায় সবল হয়ে আমিও সন্তোষের শান্তি লাভ করতে পারতুম। অবশ্য তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক অল্প, জীবনের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অনেকটা সীমাবদ্ধ, এবং তোমার স্বভাব একহিসাবে আমার চেয়ে সহজেই শান্ত সংযত এবং ধৈর্য্যশীল। সেইজন্যে সর্ব্ব প্রকার ক্ষোভ হতে মনকে একান্ত যত্নে রক্ষা করবার প্রয়োজন তোমার অনেক কম। কিন্তু সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোন কালে আসেই— ধৈর্য্যের সাধনা, সন্তোষের অভ্যাস কাজে লাগেই। তখন মনে হয় প্রতি-দিনের যে সকল ছোট খাট ক্ষতি ও বিঘ্ন, সামান্য আঘাত ও বেদনা নিয়ে আমরা মনকে নিয়তই ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত করে রেখেছি সে সব কিছুই নয়। ভালবাস্‌ব এবং ভাল কর্‌ব— এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সুমিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন কর্‌ব— এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক্। জীবনও বেশি দিনের নয় এবং সুখদুঃখও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা — এ সব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে অশান্তিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সংঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই — তা হলে জীবন একেবারেই ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম— এই হল জীবনের

সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তাহলে তোমার জীবন সাম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক। ভাই ছুটি— মনকে যথেচ্ছা খুঁৎখুঁৎ করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই স্বেচ্ছাকৃত। আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি এ কথাগুলি বল্‌চি। তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তার একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে সেই নির্ম্মল শান্তি এবং সুখই সংসারের আর সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়— আজ কাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত জাগ্রত হয়ে আছে। [স্ত্রীপুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ— বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—] নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়— সেইজন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জ্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে

এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না— কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্ম্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জ্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্, আমাদের চতুর্দ্দিক্ প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক্, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্,— এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি— সেখানে কোনমতেই লাভক্ষতি আত্মপরকে

ভোল্‌বার যো নেই— সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ কালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না। এখানে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা তত শক্ত নয়, যে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।

তোমার রবি

প্রমথ সুরেন এবং প্রমথদের একটি গুজরাটী বন্ধু শিলাই-দহে আছে।

[শিলাইদহ
জুন, ১৮৯৮]

[১৭]

ওঁ

ভাই ছুটি

নীতুরা পরের রোগদুঃখশোকতাপ সহ্য করতে পারে না— সে ওদের স্বভাব। সেজন্যে তুমি বিরক্ত হয়ে কি করবে।... এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে— কিন্তু আমি মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য আলোচনা করে সেটা শান্ত-

ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করচি— একএকসময় ধিক্কার হয় কিন্তু সেটা আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে চাই। আমাদের বাইরে কে কি রকম ব্যবহার করচে সেটাকে নির্লিপ্তভাবে সুদূরভাবে দেখ্‌তে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শোকদুঃখ, বিরাগ অনুরাগ, ভাললাগা না লাগা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সংসারের কাজকর্ম্ম, সমস্তই আমাদের বাইরে ;— আমাদের যথার্থ "আমি" এর মধ্যে নেই— এই বাইরের জিনিষকে বাইরের মত করে দেখ্‌তে পারলে তবেই আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়— সে খুব শক্ত বটে কিন্তু পদে পদে সেইটে মনে রেখে দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া যায় তখনি আপনাকে আপনার অমরত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই। একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলুম সেই অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়— যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম— ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লুম— আশ্চর্য ফল হল— শরীরে কষ্ট হতে লাগ্‌ল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একটা নতুন পথ পেলুম। এখন আমি সুখদুঃখকে আমার বাইরের জিনিষ এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেকসময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি— তার মত শান্তি ও সান্ত্বনার উপায়

আর নেই। কিন্তু বারম্বার পদে পদে এইটেকে মনে এনে সকল রকমের অসহিষ্ণুতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই— মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়েও হতাশ হলে হবেনা— ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোনমতেই নষ্ট হতে দিলে চল্‌বে না— কারণ, এমন লোকসান আর কিছুই নেই— এ যেন দুপয়সার জন্যে লাখটাকা খোয়ানো। গীতায় আছে— লোকে যাকে উদ্বেজিত করতে পারে না এবং লোককে যে উদ্বেজিত করে না— যে হর্ষ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত সেই আমার প্রিয়।

কাল মঙ্গলবারে বলুর শ্রাদ্ধ। তার পরে কর্ম্ম শেষ করে যেতে এ সপ্তাহ নিশ্চয়ই চলে যাবে। এর আর কোন উপায় নেই। নগেন্দ্র ত ইতিমধ্যে তার যশোরের কাজ শেষ করে ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু যথাসম্ভব সত্বর ফিরে আসা চাই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবি

[কলকাতা
২৯ অগস্ট, ১৮৯৯]

[১৮]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার যাওয়া হয় নি সে খবর তুমি বেলার চিঠিতে পেয়েছ। বাড়িতে রয়ে গেলুম— ডাকের সময় ডাক এল— খান তিনেক চিঠি এল— অথচ তোমার চিঠি পাওয়া গেল

না। যদিও আশা করিনি তবু মনে করেছিলুম যদি হিসাবের ভুল করে দৈবাৎ চিঠি লিখে থাক। দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি— দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিষটি অল্প বলে তার দামও বেশি— দুটো চারটে কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়; তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। দেখাশোনার অনেক কথাবার্ত্তা ভেসে চলে যায়— যত খুসি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই তার প্রত্যেক কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না। বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র— তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার কি তাই মনে হয়না ?[১] …

[১৯]

ওঁ

ভাই ছুটি

তুমি করচ কি ? যদি নিজের দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্মসমর্পণ কর তা হলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি ? বেঁচে থাক্‌তে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে— মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই— শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে

১ এই চিঠির অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।

প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।

নীতু ভাল আছে এবং ক্রমশই ভালর দিকে যাচ্চে। ক'দিন একজন ডাক্তার সমস্ত রাত আমাদের সঙ্গে থেকে ঔষধপত্র দিত— কাল তার দরকার ছিলনা বলে সে আসে নি— সুতরাং সমস্ত রাতটা একলা আমার ঘাড়েই পড়েছিল। এখন তার জ্বর ৯৯°, কাশী সরল, হাঁপানী অনেক কম, নাড়ী সবল, সুতরাং আশা করবার সময় এসেছে— কিন্তু যখন নিশ্চয় কোন কথা বলা যায় না তখন সকল অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকাই উচিত। আজ থেকে ডাক্তার কেবল দু বেলা আস্‌বেন। এ ক'দিন চারবার করে ডাকতে হচ্ছিল তা ছাড়া রাত্রে একজন হাজির থাকত। তুমি কেবল শোকেই শ্রান্ত, আমি কর্ম্মে অবসন্ন। আজকাল মৃত্যুর কোন মূর্ত্তিকেই তেমন ভয় করি নে কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভাবনা হয়— তোমার মত অমন সর্ব্বসহায়বিহীন হতাশ্বাস গতাশ্রয় মন আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বলে বোধ হয়।

[কলকাতা, ১৮৯৯] রবি

[২০]

ওঁ

ভাই ছুটি

ছেলেদের জন্যে সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে— ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র— ওদের সুখদুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নেই— আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্যে কাতরভাবে সস্পৃহভাবে অপেক্ষা করবনা,— ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে— আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখবনা। আমার ছেলের উপর আমার যে মমতা, এবং সে সব চেয়ে ভাল হবে বলে আমার যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটা অহঙ্কার থেকে হয়। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমার নেই। কত লোকের ছেলে যে কত মন্দ অবস্থায় পড়ে, আমরা তার জন্যে কতটুকুই বা ব্যথিত হই? সংসারের চেষ্টা যে যতই করুক্ অবস্থা ভেদে তার ফল নানারকম ঘটে থাকে— সে কেউ নিবারণ করতে পারে না। অতএব আমরা কেবল

কর্ত্তব্য করে যাব এইটুকুই আমাদের হাতে— ফলাফলের দ্বারা অকারণ নিজেকে উদ্বেজিত হতে দেব না। ভালমন্দ দুই অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে— ক্রমাগত পদে পদে রাত্রিদিন এই অভ্যাসটি করতে হবে— যখনি মনটা বিকল হতে চাইবে তখনি আপনাকে সংযত স্বাধীন করে নিতে হবে, তখনি মনে আন্‌তে হবে সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ ফলাফল থেকে আমি পৃথক্— আমি একমাত্র এই সংসারের নই— আমার অতীতে যে অনন্তকাল ছিল সেখানে আমার সঙ্গে এই সংসারের কি যোগ ছিল, এবং আমার ভবিষ্যতে যে অনন্ত কাল পড়ে আছে সেইখানেই বা এই সমস্ত সুখদুঃখ ভালমন্দ লাভ অলাভ কোথায়! যেখানে যে কয়দিন থাকি সেখানকার কাজ কেবল সযত্নে সম্পন্ন করতে হবে— আর কিছুই আমাদের দেখবার দরকার নেই। সর্ব্বদা প্রসন্নতা রাখ্‌তে হবে, চারিদিকের সকলকে প্রসন্নতা দান করতে হবে— সকলে যাতে সুখী হয় এবং ভাল হয় আমি প্রফুল্লমুখে এবং অশ্রান্ত চিত্তে সেই চেষ্টা করব— তার পরে বিফল হই তাতে আমার কি?— ভাল চেষ্টার দ্বারাতেই জীবন সার্থক হয়— ফল সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে। কেবল কর্ত্তব্য করেই প্রফুল্ল হতে হবে— ফল না পেয়েও প্রফুল্লতা রাখতে হবে— তার একমাত্র উপায় মনকে সর্ব্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে সর্ব্বদা মুক্ত করে রাখা।

[১৮৯৯] রবি

[২১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েচে, তার মাও সম্মতি দিয়েচেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল। পর্শু অর্থাৎ শনিবারে এখান থেকে ছাড়ব। ভাগ্যি সুরেন মোগলসরাই থেকে আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে ক'টা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।

কলকাতায় আমার শরীরটা ভারি খারাপ হয়ে এসেছিল। যাত্রার দিনে দশ গ্রেন কুইনীন খেয়ে বেঁরিয়েছিলুম— পথেই অনেকটা আরাম পেলুম— আজ আর শরীরে কোন গ্লানি নেই।

কাল রাত্রে গাড়ি ছেড়ে দিলে পর আলোগুলোর নীচে পর্দ্দা টেনে দিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া গেল— বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল— আমি গাড়িতে একলা ছিলুম— মনটা বড় একটি সুমিষ্ট মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল— তুমি তখন কোথায় কি করছিলে? ছাতে ছিলে, না ঘরে? কি ভাবছিলে? আমার হৃদয়টি জ্যোৎস্নারই মত স্নিগ্ধকোমলভাবে তোমাদের উপরে ব্যাপ্ত হয়েছিল— তার মধ্যে বাসনা বেদনার

তীব্রতা ছিলনা— কেবল একটি আনন্দ বিষাদমিশ্রিত সুমঙ্গল সুমধুর ভাব।

[এলাহাবাদ, ১৯০০] রবি

[২২]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ত তোমার চিঠি পাওয়া যায় নি। আজও তোমার চিঠি পাই নি মনে করে টেলিগ্রাফ করতে উদ্যত হয়েছিলুম। তার পরে স্নান করে বেরিয়ে এসে তোমার চিঠি পাওয়া গেল কিন্তু তাতে কাল চিঠি লেখনি এমন কোন খবর দেখলুমনা— ঠিক বোঝা গেল না।

কাল নগেন্দ্রকে প্রিয়বাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই-সঙ্গে আমাদেরও ছিল। কাল প্রায় ১টা থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত রিহার্সাল ছিল, তার পরে প্রিয়বাবুর ওখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি আস্‌তে হল।

নীতু কাল রাত্রে ঘুমিয়েছে। তার লিভারের বেদনা প্রায় গেছে। জ্বর আজ ১০০°র কাছাকাছি আছে। লিভারটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বল্‌চেন অনেক কমেচে।

আজ বিকালে আমাদের অভিনয়। ডাক্তার বেচারা দেখবার জন্য লুব্ধ হওয়াতে আজ তাকে একখানা টিকিট দিয়েছি— নগেন্দ্রও যাবে।— ডাক্তার ও নগেন্দ্র কাল সকালে

চলে যাবে— নগেন্দ্রকে এখন এখানে রাখলে কাজের ক্ষতি হবে।

গিরিশঠাকুর এসেছিল। সে ইংরাজি বাংলা সব রকম· বেশ ভাল রাঁধতে পারে— কিছু বেশি মাইনে নেবে কিন্তু কেউ এলে খাওয়াবার কোন ভাবনা থাকবে না। তুমি কি বল ?

এবারে আমি ফিরে গিয়েই চড়ে আড্ডা করব— সে তোমাদের খুব ভাল লাগ্‌বে আমি জানি। ইতিমধ্যে নীতু একটু সেরে উঠ্‌লে তাকে মধুপুরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তোমার মাকে ১৫ টাকা পাঠিয়ে দিতে যদুকে বলে দেব।

বিপিন অনেকটা সেরে উঠেছে— এখনো সে নুয়ে কাজ করতে পারে না— কিন্তু চল্‌তে ফিরতে পারচে। বেহারাটা দুই একদিনের মধ্যেই শিলাইদহে যেতে পারবে। তোমার নতুন ছোকরা চাকরটা কি রকম কাজের হয়েছে ? আজ ত পয়লা— এখনো ৭ই পৌষের লেখায় হাত দিতে পারিনি বলে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কাল যেমন করে হোক্ লিখ্‌তে বস্‌তে হবে।

[কলকাতা
১৫ ডিসেম্বর, ১৯০০]

[২৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার সন্ধ্যা বেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করে বল্‌তে পারিনে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে। যাক্ গে! হৃদয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করাটা লাভজনক কাজ নয়। মোটামুটি সাদাসিধে ভাবে সব গ্রহণ করাই ভাল।

আজ নীতু ভাল আছে। অল্প জ্বর আছে— প্রতাপবাবু বলেন অমাবস্যাটা গেলে সেটা ছেড়ে যেতেও পারে। জ্বরটা গেলেই তাঁর মতে বিলম্ব না করে মধুপুরে পাঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাই ঠিক করেছি। লিভারের আয়তন এবং বেদনা অনেকটা কমে এসেছে।

কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ এবং কি সব নিয়ে আমাকে বক্‌চ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখ্‌লেই হয়— সংসারে জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে— আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলেত আর

পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালেও মনটা কি রকম খারাপ হয়ে ছিল। তার উপরে আজ সমস্ত সকাল ধরে লোকসমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখ্‌ব তা আর লিখ্‌তে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।

[কলকাতা
ডিসেম্বর, ১৯০০]

রবি

[২৪]

ওঁ

ভাই ছুটি

বড় হোক্ ছোট হোক্ ভাল হোক্ মন্দ হোক্ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখনা কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে! আজ আবার বিশেষ করে তোমার চিঠির অপেক্ষা করছিলুম— রথী আস্‌বে কিনা তোমার আজকের সকালের চিঠিতে জান্‌তে পারব মনে করেছিলুম। যাই হোক্ চিঠি না পেলে কি রকম লাগে তোমাকে দেখাবার ইচ্ছা আছে। কাল বিকালে আমরা বোলপুরে চলে যাচ্ছি অতএব এ চিঠির উত্তর তোমাকে আর লিখ্‌তে হবে না— একদিন ছুটি পাবে। রবিবার সকালে এসে আশা করি তোমার একখানা চিঠি পাওয়া যাবে। শনিবারে আমরা শান্তিনিকেতনে থাক্‌ব, সেদিন আমিও চিঠি লিখ্‌তে সময় পাবনা।

নায়েবের ভাইয়ের খবর কি? নীতুর লিভার আজ পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা সম্পূর্ণ কমে গেছে— এখন কেবল তার কাশি এবং জ্বরটা কমলেই তাকে মধুপুরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। জ্বর খুব অল্প অল্প করে কমচে— অমাবস্যা গেলে হয়ত ছাড়তে পারে।

তোমাদের বাগান এখন কি রকম? কিছু ফসল পাচ্চ? কড়াইস্যুটি কতদিনে ধরবে? ইঁদারায় ফটিক রোজ ফট্‌কিরি দিচ্চে ত? জল সাফ হচ্চে? বামুন বাম্‌নীতে কি ভাবে চল্‌চে? বিমলা সম্বন্ধে তোমার মত আমাকে শীঘ্র লিখো। ৭ই পৌষের লেখাটা নানা বাধার মধ্যে লিখ্‌চি এখনো শেষ হয় নি। এখন সেই লেখাটাতে হাত দিই গে যাই।

[কলকাতা
ডিসেম্বর, ১৯০০]

রবি

[২৫]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ একদিনে তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবার অবসর নেই।… আজ বোলপুর যেতে হবে। বাবামশায়কে আমার লেখা শোনালুম তিনি দুই একটা জায়গা বাড়াতে বল্লেন— এখনি তাই বস্‌তে হবে— আর ঘণ্টাখানেকমাত্র সময় আছে … আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো

না— আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাক্‌ত খুব ভাল হত— কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই— আমি যা কিছু জান্‌তে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি— আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়— তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করিনে— কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে— আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই— সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর— আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।

[কলকাতা
ডিসেম্বর, ১৯০০]

রবি

[২৬]

ভাই ছুটি

কাল যখন বাড়ি ফিরে এলুম তখন ঢংঢং করে দুপুর বেজে গেল। সকালে গান শেখাবার কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে নাটোরের বাড়িতে যাওয়া গেল— অমলার সন্ধানে। দেখি হেশ নাটোরের ছবি আঁকচে— রাণীর ছবিও খানিকটা আঁকা পড়ে আছে। অমলার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করা গেল— অমলা বল্লে যখন হাতে পেয়েছি তখন ছাড়ব কেন, আমাদের বাড়িতে যাবেন সেখানে গান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আজ তিনটের সময় তাদের সেই বির্জ্জিতলার বাড়িতে গিয়ে মিষ্টান্ন ভোজন ও মিষ্ট কথার আলোচনা করতে হবে। ওখান থেকে সরলার সন্ধানে গেলুম— সরলা বাড়িতে নেই— তারকবাবু আর নদিদি— অনেকক্ষণ সরলার জন্যে অপেক্ষা করা গেল এলনা— নদিদি বল্লেন কাল সকালে এসে খেয়ো সেই সঙ্গে সরলাকে গান শিখিয়ে নিয়ো— তাতেই রাজি। তারকবাবু বল্লেন খাবার আগে আমার ওখানে যেয়ো পুরীর বাড়িসম্বন্ধে কথা আছে— তাই সই। আজ সকালে স্নান করে প্রথমে তারকবাবু, পরে নদিদি, পরে সুরেন, পরে অমলাকে সেরে বাড়ি এসে ১১ই মাঘের গান শিখিয়ে রাত্রে সঙ্গীতসমাজ সেরে ১২টার সময় নিদ্রার আয়োজন করতে হবে। ওদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— রাত্রে খুব এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে— আবার হবার মত মেঘ জমে রয়েছে। শীতকালে আমি ত কখনো এমন মেঘ দেখি নি। তোমাদের ওখানেও সম্ভবতঃ

এই রকম মেঘের আয়োজন হয়েছে— এই শীতকালের বাদল তোমাদের নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগ্‌চে— আমি ত সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কাটাই, ভাল মন্দ লাগবার অবসরমাত্র পাই নে— বিকেলের দিকে যখন শরীরটা শ্রান্ত হয়ে আসে তখন স্বভাবতই তোমাদের দিকে মনটা চলে যায়— তখন গাড়ি হয় ত কলকাতার জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে ছুট্‌চে আর আমার সমস্ত চিন্তা শিলাইদহের ঘর কখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ির মধ্যে এবং দুপুর রাত্রে বিছানায় ঢুকে তোমাদের মনে করবার অবকাশ পাই— বাকী কেবল গোলমাল। আজ তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমাকে বেরতে হবে তাই সকালে উঠেই তোমাকে চিঠি লিখে নিচ্চি— চিঠি সেরেই স্নান করতে যাব— স্নান করেই দৌড়। সেদিন সত্যর ছেলেদের দেখলুম— বেশ ছোটখাট গোলগাল দেখতে হয়েছে— ভারি মজার রকম ধরণের। বড়দিদি এবারই মাঘের আগেই চলে আস্‌চেন— গগনরাও দশই মাঘে আস্‌বে আবার সমস্ত ভরপূর হয়ে উঠ্‌বে। ইলেক্ট্রীক আলোর তার গগনদের বাড়িতে আস্‌চে, ওদের হয়ে গেলেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের শূন্যঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলতে সুরু হবে। ...

[কলকাতা
জানুয়ারি, ১৯০১]

তোমার রবি

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল সুরেনের ওখানে গিয়েছিলুম। সে একটু ভাল বোধ করচে— তাকে এখন প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করচেন— কাল অমাবস্যা, তাই জ্বরটা বোধ হয় অমাবস্যা না কাট্‌লে কম্‌বেনা। মেজবোঠান কালও বেলা এবং রেণুকাকে আনাবার জন্যে বিশেষ করে বল্‌লেন— বিবির বাড়িতে ওদের রাখ্‌তে কোন অসুবিধা হবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি কি বিবেচনা কর— ওরা এত করে আস্‌তে চাচ্চে— না আস্‌তে পারলে বড় নিরাশ হবে— তাই ওদের জন্যে মায়া হয়— নগেন্দ্রর সঙ্গে রাণী রথী বেলাকে একটা সেকেণ্ডক্লাস রিজার্ভ করে পাঠালে মন্দ হয় না— মঙ্গলবার ৯ই মাঘে আস্‌বে— ১১ই মাঘ দেখে নীতুর সঙ্গে চলে যেতে পারে। মেজবোঠান জান্‌তে চান কোন্ ট্রেনে আস্‌বে— তাদের আনতে গাড়ি পাঠাবেন। যদি পাঠানই স্থির কর তাহলে টেলিগ্রাফ কোরো— না হলে জানব আস্‌বেনা। দুতিনদিনের জন্যে বেলা বিবিদের ওখানে থাক্‌লে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিনে। যাহোক্ তুমি যা ভাল বিবেচনা কর তাই কোরো। মেজবোঠান তোমাকে বল্‌তে বলে দিয়েছেন যে দাসী পাওয়া যাবে— বোধহয় শীঘ্র পাঠাতে পারবেন। শেলাই প্রভৃতি জানে এমন ভদ্ররকম ক্রিষ্টান্ দাসীও পাওয়া যেতে পারে— চাও ত বলি— মাইনে টাকা

আষ্টেক। আমার ত বোধ হয় এ-রকম দাসী হলে তোমার মন্দ হয় না। আমরা এবার বোটে গিয়ে থাক্‌ব— সেখানে চাকরের অভাব তুমি তেমন অনুভব করবে না— তপ্‌সি থাকবে, অন্যান্য মাঝিও থাকবে, তোমার ফটিক থাকবে পুঁটে থাক্‌বে, বিপিন থাক্‌বে, মেথর থাক্‌বে— অনায়াসে চলে যাবে— ল্যাম্পের ল্যাঠা নেই, জল তোলার হাঙ্গাম নেই, ঘর ঝাঁড় দেওয়ার ব্যাপার নেই— কেবল খাবে স্নান করবে, বেড়াবে এবং ঘুমবে। কালও রাত দুপুরের সময় এসেছি— সমস্ত দিন উৎপাত গেছে। আজ সকাল বেলায় এক চোট সাক্ষাৎকারীদের সমাগম এবং গানশিক্ষার হাঙ্গাম শেষ করে আহারটি করেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি— এখনি সঙ্গীতসমাজওয়ালারা তাদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে— সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেনকে দেখ্‌তে বালিগঞ্জে যাব— সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে গান শেখানর ব্যাপারে রাত নটা বেজে যাবে— তার পরে সঙ্গীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে। — চৈতন্য ভাগবত এনেছি— বিপিন একখানা মলিদা ও একটা রাগ্‌ এনেছে দেখেছি— মলিদা আনবার কি দরকার ছিল আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। নানা ব্যস্ততার মাঝখানে অল্প একটুখানি অবকাশে তোমাকে তাড়াতাড়ি করে লিখে ফেলতে হয় ভাল করে মন দিয়ে লিখতে পারিনে।

[কলকাতা
জানুয়ারি, ১৯০১]

রবি

[২৮]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল পুণ্যাহের গোলমালে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। পর্শুদিন বিকেলে শিলাইদহে এসে পৌঁছলুম। শূন্য বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলুম অনেকদিন নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জ্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু যেখানে বরাবর সকলে মিলে থাকা অভ্যাস, এবং একত্রবাসের নানাবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান সেখানে একলা প্রবেশ করতে প্রথমটা কিছুতেই মন যায় না। বিশেষতঃ পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে যখন বাড়িতে এলুম তখন বাড়িতে কেউ সেবা করবার, খুসি হবার, আদর করবার লোক পেলুম না ভারি ফাঁকা বোধ হল। পড়তে চেষ্টা করলুম পড়া হল না। বাগান প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে কেরোসিন্‌-জ্বালা শূন্যঘর বেশি শূন্য মনে হতে লাগ্‌ল। দোতলার ঘরে গিয়ে আরো খালি বোধ হল। নীচে নেমে এসে আলো উস্কে দিয়ে আবার পড়বার চেষ্টা করলুম— সুবিধে করতে পারলুম না। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দোতলার পশ্চিমের ঘরে আমি এবং পূর্ব্বের ঘরে রথী শুয়েছিল। রাত্রি রীতিমত ঠাণ্ডা— গায়ে মলিদা দিতে হয়েছিল। দিনেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্ত্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্ত্তন শুন্‌তে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছগুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারচেনা। চালানের সঙ্গে তোমার শাক কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কুম্‌ড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ— তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি খুব ফুট্‌চে। হাস্নু-ও-হানা ফুট্‌চে কিন্তু গন্ধ দিচ্চেনা, বোধ হয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকেনা।

দুটো চাবি পেয়েছি— কিন্তু আমার কর্পূর কাঠের দেরাজের চাবিটা দরকার। তার মধ্যে রথীর ঠিকুজি আছে সেইটের সঙ্গে মিলিয়ে রথীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করতে দিতে হবে। সেটা চিঠি পেয়েই পাঠিয়ো।

নীতু কেমন আছে লিখো। প্রতাপবাবু রোজ দেখ্‌তে আস্‌চেন ত? যাতে ওষুধ নিয়মিত খাওয়া হয় দেখো।

পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সাম্‌নে আখের ক্ষেত খুব বেড়ে উঠেছে। চতুর্দ্দিকের মাঠ শেষ পর্য্যন্ত শস্যে পরিপূর্ণ— কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আস্‌বনা শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।

শরতের আর চিঠিপত্র এসেছে? তার সম্বন্ধে আর কোন খবরবার্ত্তা আছে? বেলা যেন তাকে ভাল করে চিঠিপত্র লেখে। কি পাঠ লিখ্‌তে হবে যদি ভেবে না পায় আমাদের

চিরকেলে দস্তুরমত শ্রীচরণকমলেষু লিখ্‌লেই হয়— বাঁধাদস্তুরে গেলে ভাবনা থাকেনা। এখান থেকে কোন জিনিষ যদি দরকার থাকে লিখো। দই মাছ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

[শিলাইদহ, ১৯০১] রবি

[২৯]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর থেকে আমি লেখায় হাত দিয়েছি। একবার কোন সুযোগে লেখার মধ্যে পড়তে পারলেই আমি যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছ জলে গিয়ে পড়ি। এখন এখানকার নির্জ্জনতা আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করেছে, সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি আমাকে আর স্পর্শ করতে পারচেনা, যারা আমার শত্রুতা করেছে তাদের আমি অতি সহজেই মার্জ্জনা করেছি। নির্জ্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয় কেন তা আমি বেশ সহজেই বুঝ্‌তে পারচি— আমার এই ভাব সম্ভোগের অংশ তোমাদের যদি দিতে পারতুম তা হলে আমি ভারি খুসি হতুম, কিন্তু এ জিনিস কাউকে দান করা যায় না। কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মত শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগ্‌বেনা— এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য্য থেকে যাবে। কিন্তু কি

করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে— সেই জন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি— সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চল্‌তে পারি নে। তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না— সকলেই কি রকম উড়ু উড়ু করতে থাকে। কাজেই তোমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয় ত পারব, কিন্তু কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাক্‌তে পারবনা। সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় মেঘ জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হল— আমার নীচের ঘরের চারদিকের শাসি বন্ধ করে এই বর্ষণদৃশ্য উপভোগ করতে করতে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি। তোমাদের সেখানকার দোতলার ঘর থেকে এ রকম চমৎকার ব্যাপার দেখতে পেতে না। চারিদিকের সবুজ ক্ষেতের উপরে স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগচে।[১] বসে মেঘদূতের উপর একটা প্রবন্ধ লিখ্‌চি।[১] প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখ্‌তে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিষ করে রাখ্‌তে পারতুম তাহলে কেমন হত! আমার লেখায়

১ ইহার পর পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে।

অনেক রকম করে অনেক কথা বল্‌চি— কিন্তু কোথায় এই মেঘের আয়োজন, এই শাখার আন্দোলন, এই অবিরল ধারাপ্রপাত, এই আকাশপৃথিবীর মিলনালিঙ্গনের ছায়াবেষ্টন! কত সহজ! কি অনায়াসেই জলস্থল আকাশের উপর এই নির্জ্জন মাঠের নিভৃত বর্ষার দিনটি— এই কাজকর্ম্মছাড়া মেঘেঢাকা আষাঢ়ের রৌদ্রহীন মধ্যাহ্নটুকু ঘনিয়ে এসেছে— অথচ আমার সেই লেখার মধ্যে তার কোন চিহ্নই রাখ্‌তে পারলুম না— কেউ জান্‌তে পারবেনা কোন্‌দিন কোথায় বসে বসে সুদীর্ঘ অবসরের বেলায় লোকশূন্য বাড়িতে এই কথাগুলো আমি আপনমনে গাঁথছিলুম! খুব এক পস্‌লা বর্ষণ হয়ে থেমে এসেছে— এই বেলা চিঠি পাঠাবার উদ্যোগ করা যাক্।

[শিলাইদহ
জুন, ১৯০১]

রবি

[৩০]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের চালান আজ যাবে মনে করেছিলুম— কিন্তু আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলনা। কাল যাবে। আমার আম ফুরিয়ে এসেছে। কিছু আম না পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। খাওয়া দাওয়া আমাদের সাদাসিধে রকম চল্‌চে, তাতে শরীরটা বেশ ভাল আছে। বামুন ঠাকুর

শিলাইদহের সুবিখ্যাত লালমোহন তৈরি করেছিল— লোভ সত্ত্বেও আমি খাইনি— দেখ্‌চি কোন রকম মিষ্টি না খেয়েই শরীরটা ভাল আছে— মিষ্টি খেলেই পাকযন্ত্র বিগ্‌ড়ে যায়। কুঞ্জ ঠাকুরকে ত আমি নিয়ে এলুম, তোমাদের আহারাদিটা কি রকম চল্‌চে? আমার এখানে কেবল মাত্র কুঞ্জ এবং ফটিকে বেশ শান্তভাবে কাজ চলে যাচ্চে— বিপিনের জলদমন্দ্রকণ্ঠস্বর না থাকাতে শিলাইদহ দিব্যি নিস্তব্ধ হয়ে আছে— কাজ চল্‌চে অথচ কাজের আস্ফালন না থাকাতে বেশ আরাম বোধ হচ্চে— বিপিন থাকলে মনে হত অপরিমিত কাজের তাড়ায় সমস্ত সংসার যেন উৎখাত হয়ে রয়েছে, কোথাও কারো যেন হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। আমার ইচ্ছে কোন কথাটি না কয়ে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে নিয়মমত হয়ে যায়— আয়োজন বেশি না হয় অথচ সমস্ত বেশ সহজে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পন্ন হয়— বেশ নিয়মে চলে অথচ অল্পে চলে এবং নিঃশব্দে চলে। একলা থাকার ঐ একটা সুখ আছে স্বীকার করতে হবে, চারদিকে প্রভূত চেষ্টার চিহ্ন এবং সরঞ্জামের ভিড় থাকে না— তাতে মনটা বেশ মুক্ত থাকতে পায়। আমি আছি বলে পৃথিবীতে একটা হুলস্থূল কাণ্ড চল্‌চেনা এইটেতে বড় হাল্কা বোধ হয়— আজকাল আমার চারদিকে লোকজন হাঁসফাঁস তোলপাড় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করচে না বলে আমার অবসরকালকে খুব বৃহৎ খুব প্রশস্ত মনে হচ্চে। সকালে ঠিক সময়েই দুটি আম খাই, দুপুরবেলায় অন্ন, বিকেলেও দুটি আম এবং রাত্রে গরম লুচি

ও ভাজা— সাদাসিধে খাওয়া ও নিয়মমত খাওয়া বলে ক্ষুধা থাকে খেয়ে তৃপ্তি হয়— ঘড়ি ঘড়ি ওষুধ খেতে হয় না। কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আন্‌তে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না— জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গামহুজ্জতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে— আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেল্‌লে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেল্‌তে হয়, সামান্য জিনিষেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— সে ফাঁকা কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়— সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আস্‌বাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা— খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন— চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত স্বল্পতা— ড্রয়িংরুম না, ডাইনিংরুম্ না, নবাবীও না— তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা— শান্তি এবং সন্তোষ— কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না— এই হলেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। যাই নাইতে।

[শিলাইদহ, ১৯০১] রবি

[৩১]

ওঁ

ভাই ছুটি

…এখানে খুব গরম পড়েছে। শরীর আমার বেশ ভালই আছে কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুমতে পারিনে— অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায় বসে থাকি— হিম কিছুমাত্র নেই। কাল বসে বসে মনে পড়্ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে— আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বস্‌তে তাহলে বোধ হয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়— আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে— তা ছাড়া অনন্ত নক্ষত্র লোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়ষার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখ্‌তেও পাওয়া যায় না।

[শিলাইদহ, ১৯০১] তোমার রবি

ওঁ

ভাই ছুটি

কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছি। এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখ্‌লুম না। তাকে গতকল্য কাশিতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার খাট বিছানা তেমনি পড়ে রয়েছে, আলনায় তার অত্যন্ত ময়লা কাপড় ঝুল্‌চে— কিন্তু সে নেই! হায়!

তোমার মার বাতের মতো হয়ে কষ্ট পাচ্চেন। শিলাইদহে ভাল ছিলেন কুষ্টিয়ায় এসে তাঁকে বাতে ধরেছে। তোমাদের কিনুরামের প্রফুল্ল মুখ পুষ্টশরীর দেখে তৃপ্তি লাভ করা গেল। সে আমার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে আলাপ করবার জন্যে বারম্বার ফিরে ফিরে আস্‌চে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, কিন্তু আমাকে চিঠি লেখায় নিযুক্ত দেখে দুঃখিত মনে চলে যাচ্চে।

ষ্টীমারের অপেক্ষায় বসে আছি। বৈকালে শিলাইদহে চলে যাব।

কলকাতার নতুন বাড়িতে যে আলমারিতে বই আছে তার চাবি কার কাছে? তার থেকে গোটাকতক বই আমার দরকার।

কাল অর্দ্ধরাত্রে কলকাতায় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার যাত্রার আয়োজন আর কি। এখানে তিনচার দিন

বৃষ্টি নেই— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে— গরম নিতান্ত মন্দ নয়। শিলাইদহে পৌঁছে হয় ত দেখ্‌ব— পাট পচার নিস্তব্ধ তুর্গন্ধে সেখানকার বাতাস পরিপূর্ণ।

ওল তোমার মাকে দিয়েছি। সত্যকেও দিয়ে এসেচি। মনীষারা এতদিনে নিশ্চয় বোলপুরে গেছে। তোমরা খুব ব্যস্ত আছ বোধ হয়। খুব বেড়াতে যাচ্চ কি? জগন্নাথ মনীষাদের হাত দিয়ে তোমাদের কাপড় চোপড় ফলমূলমিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।

আজ খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছে। তোমার মা কোনো-মতেই ছাড়লেন না— অনেকদিন পরে পীড়াপীড়ি করে মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। মুখে কিন্তু তার স্বাদ আদবে ভাল লাগ্‌লনা। একটি ঠিকা ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একটাকা বেতন দিয়ে সঙ্গে এনেছি। অল্প দিন থাক্‌ব তাই এত মাইনে দিয়ে আন্‌তে হল। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে বিপিনের হাতের রান্না কি বলে খাই বল!

রথীর পড়ার যাতে কিছুমাত্র অনিয়ম না হয় সেইটে তোমাকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। এইখানে ··· বিদায় হই।

[কুষ্টিয়া, শিলাদহের পথে
১৯০১]

তোমার রবি

[৩৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে বাঙালিরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্চে— শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না— মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে— নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। শরৎ ত ভীড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হল। তোমার বুদ্ধিতেই বেলার গয়না খোয়া গেছে। আমি তাই মনে স্থির করেছি তোমার বুদ্ধিতে আর চল্‌বনা— আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্‌চে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধ হয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।

বেলা বোধ হচ্চে এখন বেশ স্থির হয়ে নিজের ঘরকন্নাটি জুড়ে নিয়ে বসেছে। গোছান গাছানর কাজে এখন ওর দিনকতক বেশ কাট্‌বে। ওর সেই সব শামুক শাঁখ প্রভৃতি বেরিয়েছে। যেখানে ওর বসবার ঘর স্থির হয়েছে সে ওর পছন্দ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় শরতে ওতে মিলে কুমারসম্ভব

পড়া হবে এই রকম একটা কল্পনাও চল্‌চে। যদিও পড়াশুনো কি রকম অগ্রসর হবে সে সম্বন্ধে আমার খুব সন্দেহ আছে।

আজ রোদ উঠে চতুর্দ্দিক বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। প্রথম এসেই দিন দুই খুব মেঘলা এবং গুমট গেছে। নতুন জায়গায় এবং নতুন সংসারে প্রবেশের সময় এই রকম অন্ধকার এবং গুমটভাবে মনটাকে পীড়িত করে। সেইটে কেটে গিয়ে আজ সূর্য্যালোকে সমস্ত বেশ প্রসন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করেছে। একটা আশ্চর্য্য এই দেখচি এই বিবাহ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদে প্রায় আরম্ভটায় গোলমাল এবং ব্যাঘাত— তার পরেই কেটেকুটে গিয়ে সমস্ত পরিষ্কার। গাড়ী রিজার্ভ করা নিয়ে কি রকম হল মনে আছে ত? বেরবার সময় কি ভয়ানক বৃষ্টি— যেতে যেতে পথেই সমস্ত চুকে গেল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওদের জীবনেও কোন বিঘ্ন বিপদ অশান্তি অনৈক্য স্থায়ী না হয়। শরৎকে যত দেখচি খুব ভাল লাগ্‌চে— ওর বাইরে কোন আড়ম্বর নেই— ওর যা কিছু সমস্ত মনে মনে। লজ্জা করে ও কিছু প্রকাশ করতে পারে না, তার থেকে ওর হৃদয়ের গভীরতা প্রমাণ হয়। বেলাকে ও খুব ভাল বাসে এবং বাসবে সন্দেহমাত্র নেই। এদিকে উপার্জ্জনশীল উদ্যমশীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিরলস, ওদিকে এলোমেলো, অসতর্ক, অসন্দিগ্ধ, টাকাকড়ি সম্বন্ধে অসাবধান— যেখানে সেখানে যা তা ফেলে রেখে দেয়, হারায়, কাউকে কিছুমাত্র সন্দেহ করে না। পুরুষমানুষের মত কাজের এবং পুরুষমানুষের মত অগোছালো। এই জন্যেই ওকে বিশেষ

করে আমার ভাল লাগে।···ঠিক উল্টো। তার সমস্ত গোনাগাঁথা, হিসেব করা— মেয়েমানুষের মত ছোটখাটোর প্রতি দৃষ্টি এবং লোকের প্রতি সন্দেহ— যত্ন আদর করতে কথাবার্ত্তা কইতে জানে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব। শরৎ সে রকম বাইরে দেখাতে পারে না তবু এখানকার সকলেই তাকে ভালবাসে— সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে শরৎবাবুর মত পপ্যুলার লোক মজঃফরপুরে দ্বিতীয় নেই। মেয়েদের চোখে···যতই চটক লাগাক, পুরুষোচিত ঔদার্য্য এবং আড়ম্বরহীন সরলতা ও আন্তরিক সহৃদয়তায় শরৎ···র চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। ঠিক আমার মনের মত এমন ছেলে আমি পেতুম না। ওকে মনে করতে পার বেশি গম্ভীর, কিন্তু তা নয়— ভিতরে ভিতরে ওর মধ্যে হাস্যরস আছে— বেলার সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ টাট্টাঠুট্টি চলে। এখনকার সভ্য ছেলেদের মত দেশকাল পাত্র বিচার না করে সকল অবস্থাতেই ছেব্‌লামি করে না। যাই হোক্ শরতের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো— এমন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না। তা ছাড়া সংসারে ও প্রতিপত্তি লাভ করবে সেও নিশ্চয়। এখন, বেলা যদি নিজেকে আপনার স্বামীর যোগ্য স্ত্রী করে তুল্‌তে পারে তাহলেই আমি চরিতার্থ হতে পারি। অমাবস্যা হয়ে গেল। নীতুর জন্যে আমার মন চিন্তিত হয়ে আছে। এ চিঠির উত্তর আমাকে দিয়ো না— এখানে আমার চিঠিপত্র কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাতে বারণ করে দিয়ো। বোধ হয় আমি পর্শু রওনা হয়ে একবার বোলপুর

দেখে আগামী সোমবারের মধ্যে বাড়ি পৌঁছব। আমার চিঠি আদি বোলপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ো।

[মজঃফরপুর
জুলাই, ১৯০১]

তোমার রবি

[৩৪]

ওঁ

ভাই ছুটি

বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়— বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে— নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি ভেবে দেখ্‌লুম বিবাহের পরে অন্ততঃ কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাক্‌লে তার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, পিতৃপক্ষ এবং স্বামীপক্ষের অভ্যাস রুচি প্রভৃতি একরকম নয়, একটু আধ্‌টু তফাৎ হতেই হবে— সে স্থলে বাপ মা কাছে থাক্‌লে মেয়েরা তাদের পিতৃগৃহের অভ্যাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সকল রকমে মিশে যেতে পারে না। দিতে যখন হবেই, তখন আবার হাতে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এ স্থলে মেয়ের সুখ এবং মঙ্গলই দেখবার বিষয়— নিজেদের সুখ দুঃখের দিকে তাকিয়ে পতিগৃহের বন্ধনের সঙ্গে আবার

পিতৃগৃহের বন্ধন চাপাবার কি আবশ্যক ? বেলা বেশ সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা কোরো। আমি নিশ্চয় বল্‌চি আমরা যদি বিবাহের পরেও ওদের দুজনকে নিয়ে ঘিরে বস্‌তুম তাহলে কখনই ভাল ফল হত না। . দূরে আছে বলে আদরও চিরদিন সমান থাক্‌বে। পূজার সময় যখন ওরা আস্‌বে কিম্বা আমরা যখন ওদের ঘরে যাব তখন নিবিড় এবং নবীন আনন্দ ভোগ করব। সকল ভালবাসাতেই খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। পরস্পরকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করলে কখনই মঙ্গল হয় না। রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর দুই আমাদের কাছে থাক্‌বে— কিন্তু তার পরে বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণ ভাবেই দূরে পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র— সেইজন্যই বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। নইলে নূতন অবস্থার প্রত্যেক ছোটখাট খুঁটিনাটি অল্প অল্প পীড়ন করে' স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরকে শিথিল করে দিতে পারে। রাণীর যে রকম প্রকৃতি— বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধ্‌রে যাবে— আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাক্‌লে ওর পূর্ব association যাবে না। তুমি নিজের কথা ভেবে দেখনা। আমি যদি তোমাকে বিবাহ করে ফুলতলায় থাক্‌তুম তাহলে

তোমার স্বভাব ও ব্যবহার অন্য রকম হত। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নিজের সুখ দুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হওয়া উচিত। তারা আমাদের সুখের জন্য হয় নি। তাদের মঙ্গল এবং তাদের জীবনের সার্থকতাই আমাদের একমাত্র সুখ। কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত— সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত— কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল— আমি ওকে নিজে পার্কষ্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম— দার্জ্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম— যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সব কথা ও ত জানে না— না জানাই ভাল। বিনা কষ্টে ওর নতুন ঘরকন্নার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে ভক্তিতে প্রেমে স্নেহে সাংসারিক কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণতা দান করুক্। আমরা যেন মনে কোন খেদ না রাখি।

আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এরকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূরে থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদিজননীর কোলে স্তনপান করচি।

[শান্তিনিকেতন
জুলাই, ১৯০১]

তোমার—

ওঁ

ভাই ছুটি

পথে অনেক বিঘ্ন কাটিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁচেছি। প্রথমে ত দিন দুয়েক উল্টো বাতাস বইতে লাগ্‌ল— তাতে বোটের পক্ষে নড়া-চড়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। মৃদু মন্থরগমনে চল্‌তে চল্‌তে বিলের মধ্যে পড়া গেল। জান ত বিল সমুদ্রবিশেষ— চারিদিকে জল থৈ থৈ করচে মাঝে মাঝে ডোবা ধানের মাথা ভেসে আছে— মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম এক একটা ছোট দ্বীপের মত জলের উপর জেগে রয়েছে— গোরুগুলোর চরবার জায়গা নেই— মানুষগুলোর নড়বার স্থান নেই— ডোঙায় করে ডিঙিতে করে এগ্রামে ওগ্রামে যাতায়াত তোমরা বোলপুরের মত জায়গায় থেকে এ রকম দৃশ্য কল্পনাই করতে পারবে না। চারিদিকে শেওলা কল্‌মীর দাম ভাস্‌চে— মাঝে মাঝে পদ্ম ও নাল— সেই সমস্ত মিশে এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্চে— জলে কালো কালো পানকৌড়ি— মাথার উপর মেছো চিল উড়ে বেড়াচ্চে। সন্ধ্যার সময় চারি দিকে যখন অকূল স্থির জল ধূ ধূ করে মনের ভিতরটা একরকম উদাস হয়ে যায়। সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের বৈচিত্র্য এবং জলের শব্দ আছে— এখানে তাও নেই— চারিদিকে নিস্তব্ধ শূন্য ছবি— তারি মাঝখানে কেবল পালে বোট চলবার কুল্‌কুল্‌ শব্দ। এরি উপরে

যখন ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন কোন্ একটা জনহীন মৃত্যুলোকের মধ্যে আছি। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে জানলার কাছে কেদারা টেনে নিয়ে জ্যোৎস্নায় চুপচাপ্ করে বসে থাকি— এই বিশাল জলরাশির সমস্ত শান্তি আমার হৃদয়ের উপর আবিষ্ট হয়ে আসে। পর্শু দিন এই বিলের মধ্যে হঠাৎ পশ্চিমে ঘন মেঘ করে একটা ঝড় এসে পড়ল— বোটটা ভাগ্যক্রমে তখন একটা ধানের ক্ষেতের মধ্যে ছিল তাই তাড়াতাড়ি নোঙর ফেলে কোনমতে জলের তলার মাটি আঁকড়ে রইল। ঝড় ছেড়ে গেলে বোট ছেড়ে দিলুম— কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খানিকটা গিয়েই আবার হঠাৎ ঝড়— সেবারেও দৈবক্রমে সুবিধার জায়গায় ছিলুম। নইলে বোট বাতাসে কোথায় ঠেলে নিয়ে ফেল্‌ত তার ঠিকানা নেই। এখানে এসেই খবর পেলুম আস্‌চে সোমবারেই আমাকে হাইকোর্টে হাজরি দিতে যেতে হবে— সুতরাং কালই আমাকে ছাড়তে হবে। কলকাতার শত সহস্র গোলমালের মধ্যে তোমাকে চিঠিপত্র লেখবার অবসর পাওয়া শক্ত তাই আজ এখানে বসেই তোমাকে লিখ্‌চি। এ ক'দিন জলের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করে আমার শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। আমি বুঝেছি আমার হতভাগা ভাঙা শরীরটা শোধরাতে গেলে একলা জলের উপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই। লিখ্‌তে লিখ্‌তে আবার একটা ঝড় এসে পড়ল— তপ্‌স্বী নোঙর টানাটানি করে ভারি গোল

বাধিয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বোধ হয় তোমাদের খবর পাওয়া যাবে।

[কালিগ্রাম, ১৯০১] তোমার রবি

[৩৬]

ওঁ

ভাই ছুটি

শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়। যাকে ছেড়ে যেতে হবে তাকেই বেশি সুন্দর দেখায় এই আমাদের মোহ। শিলাইদহের সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত— কিন্তু সুখটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। অথচ শিলাইদহ এখন তেমন ভাল অবস্থায় নেই। শিশিরে সমস্ত ভিজে রয়েছে, বেলা আটটা পর্য্যন্ত কুয়াশা, সন্ধ্যার পরে হিম— কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছে-তাই— চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধূম— আমরা ঠিক শিলাইদহ ত্যাগ করেছি— নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম। বোলপুর এর চেয়ে ঢের বেশি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গোলাপ যে কত ফুটেচে তার সংখ্যা নেই। খুব বড় বড় ভাল ভাল গোলাপ। বাবলা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাব্‌লা পাঠাচ্ছে।

এখান থেকে মুগ কলাই গুড় বইয়ের বাক্স যাযা

পাঠিয়েছে পেয়েছ ত? মুগকলাই প্রভৃতি সমস্ত স্কুলের জন্য। ছোলা হলে ছোলা পাঠাবে।

রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে চাই— সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে— যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। আমরা ত বাল্যকাল থেকে কেবল নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার দিকেই মন দিয়েছি— তার ফল হয়েছে বড় idea র চেয়ে, পরমার্থের চেয়ে, মনুষ্যত্বের চেয়ে, এমন কি প্রেম এবং মঙ্গলের চেয়েও আমাদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাগুলোকেই আমরা বড় দেখি— কোনমতেই কারো জন্যেই কিছুর জন্যেই তাকে অল্পমাত্রও পরাস্ত হতে দিতে পারি নে— কাজের ক্ষতি করে ব্রত নষ্ট করে প্রিয়জনদের মনে গুরুতর আঘাত দিয়েও আমাদের অতি তুচ্ছ ইচ্ছাগুলোকে লেশমাত্র খর্ব্ব করতে পারিনে। নিজের ইচ্ছাকেই এইরূপ জয়ী হতে দেওয়া এটা বস্তুত নিজেকেই পরাস্ত করা, নিজের উচ্চতন মনুষ্যত্বকে নিজের দীনতার কাছে বলি দান দেওয়া— এতে যথার্থ সুখ নেই কেবল গর্ব্বমাত্র আছে। আমাদের যা হয়েছে বোধ হয় তার আর প্রতিকার নেই— এখন ছেলেদের নিজের হাত থেকে মঙ্গলের হাতে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই— তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দশের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে ভূষিত করে তুলুন্। এই আমার কামনা— আমরা আমাদের

সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে কঠিনভাবে সংযত করে ঈশ্বরের নিগূঢ় ধর্ম্মনিয়মের যেন সহায়তা করি— পদেপদেই যেন তাকে প্রতিহত করে আপনার অভিমানকেই অহোরাত্রি জয়ী করবার চেষ্টা না করি। এতেও যদি নিষ্ফল হই তবে আমার সমস্ত জীবন নিষ্ফল হল বলে জান্‌ব।

[শিলাইদহ, ১৯০১] রবি

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী কর্তৃক লিখিত তিনখানি চিঠি

[১]

ওঁ

সুকুমার

সন্দেশ, মোরব্বা, বাতাসা পেয়েছি, বাতাসা দেখে আমরা সকলে অবাক্ হয়েছি, এত বড় বাতাসা কখন দেখিনি। সন্দেশ আমাদের বেশ লাগল, মোরব্বা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে। আমাদের এখানে খাবার বন্দবস্ত তো জানই মাছ মাংস খাবার যো নেই এ রকম অবস্থায় এ রকম সব উপহার পেলে কি রকম খুসী হবার কথা সে বলা বাহুল্য। সুশীলা, সুধী, কৃতী, দিনু, নলিনী এখানে আছে, আমাদের দলটি বেশ জমেছে। আমরা মনে করছিলুম যে তুমি হয়ত এদিক্ দিয়ে একবার হয়ে যেতে পার। আমবা তোমাকে চিঠি লিখব মনে করেছিলুম তোমার ওখানে যাবার জন্যে, কিন্তু শেষকালে দেখলুম ছেলেদের রেখে যেতে সুবিধে নেই।

[শান্তিনিকেতন, ১৮৯০] মৃণালিনী

কবির ভাগিনেয়ী সুপ্রভা দেবীর স্বামী সুকুমার হালদার মহাশয়কে লেখা।

[২]

ওঁ

চারু

অনেকদিন পরে তোমার একখানা চিঠি পেলুম। তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে

পর্য্যন্ত "কুন্তলীন" মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাঁসবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু আমার বড় অভিমান হয়েছে নাহয় আমাদের একটি সুন্দর নাতনী হয়েছে তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়, তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখছি আমার একচোট্ ঝগড়া করতে হবে, রমার সঙ্গে আমার ভাব আছে সেইজন্যে রমার চেয়ে তাকে কেউ সুন্দর বল্লে আমার ভাল লাগে না,— নিশ্চয়ই রমারও সেজন্য মনে মনে একটু রাগ হয়। যাই হোক্ বাপু লোকে বলছে এই মেয়েই সুন্দর হয়েছে রমার আর আমার মত তা নয়, এখন তোমার কি মনে হয় তা লিখো। রমা তার বোনকে নিয়ে কি করে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করে সে কি সারা-দিনই তাকে নিয়ে থাকে? তোমার চিঠিতে কোন খবর পাবার যো নেই— এবারে লিখো— রমা কি করে কি বলে কেমন আছে সব লিখো— আর ছোট মেয়েটির কথাও সব লিখো— যদিও তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি তবুও সে কি করে, কেমন হয়েছে, কি রকম আছে, দুষ্টু কি শান্ত সব লিখো, তাকে আমি অনেক দিন দেখতে পাব না বলেই তো তার সঙ্গে ঝগড়া করছি। সেজ বউরা কেমন আছে তাদের কোন খবর জানিনে যদি খবর পেয়ে থাকো তো লিখো। শুনছি নরুরা শীগ্‌গির কাশী যাবে— তোমার দেখছি তাহলে বড় একলা মনে হবে বাড়ীর মধ্যে— তুমি আর নদিদি, সেজ-দিদিরা তো আলাদা মহলেই থাকেন। তোমার বোন্ তরু

ইংরেজি কোন লোক জানেন
কি? [illegible]
আমার কাছে অমনতর আশা না
করে; আমি যে মানুষ সে রকম
নই। আমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমার [illegible]
[illegible] আমার [illegible]
আমার [illegible] আছি, আর [illegible]
[illegible] আমার [illegible]
[illegible] । আমার
[illegible] । তোমার
আমার [illegible] ।

[illegible]

এসেছিল কি? তোমার কাছে এখন কে দাসী আছে? প্রসবের সময় কষ্ট পাওনি তো? এখন কী রকম আছ? তোমাদের প্রত্যেক খবর দিও— তুমি জাননা আমার কতটা জানতে ইচ্ছে করে। তুমি যে দই খেতে চেয়েছ সেটী তো এখন হবে না— তুমি দই খাবে আর আমার নাতনীটী কাশতে আরম্ভ করবে, সে হবে না। যখন সে দুধ খাবে না তখন বোলো অনেক দই পাঠিয়ে দেব, উনি বলছিলেন "তা পাঠিয়ে দাওনা— সুধী খেতে পারবে" আমার বাপু সে পছন্দ হোল না, ছেলে খাবে বউ খাবে না— সে কি হয়। বিশেষতঃ তুমিই আমাদের লক্ষ্মী বউ— সব বউদের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আজকাল তোমার ছাড়া আর তো কারো সুন্দর ছেলে মেয়ে হয় না। একটি কাজ কোরো ভুলো না— সত্যকে বলে রেখো যখন কেউ লোক আসবে কিংবা যদি নতুন ঠাকুর আসে তোমাকে বলে যেন— তুমি রমা রাণীর আর খুকুমণীর দুজন-কার দুটো গায়ের মাপ অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিও, খুকীর সামনের দিকে খোলা হবে কি বন্ধ হবে তাও বলে দিও। কি এককাজ কোরো যদি বালিগঞ্জের দরজি যায় তার কাছে দিও, বোলো যে আমার দরজি যেদিন আসবে তার কাছে দিতে, কিন্তু ছোট কি বড় কিছু যদি বদলাবার থাকে আমাকে লিখে দিও। রমার মল কি তৈয়েরী হয়েছে? যদি তৈয়েরী হয়ে থাকে কত মজুরী লাগল— বোলো পাঠিয়ে দেব আমি তখন তাড়াতাড়িতে দিতে পারিনি, যদি না হয়ে থাকে তো তাড়া দিয়ে করিয়ে দিও। সুধীর কি খবর হাইকোর্টে যায়?

এখন কি তার প্রাকটিস্ করবার সময় হয়েছে কোন কেস্ পেয়েছে কি? পুটেকে বোলো সে যেন আমার কাছে থাকবার আশা না করে, আমি বেশ আছি সে যেয়ে অবধি ঝগড়া লাগালাগি কাকে বলে জানিনে, সে তো নদিদির কাছে থাকতে পারে তাতে তো আমাব কোন আপত্তি নেই আর তা ছাড়া আমার আপত্তি থাকলেও তাতে তো তাঁদের রাখা আটকে থাকবে না। আমরা সব ভাল আছি, আজ কদিন থেকে খোকার সর্দ্দি জ্বর হয়েছিল আজ স্নান করবে সেইজন্যে তোমাকে এ কয়দিন লিখতে পারিনি। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

মৃণালিনী

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী চারুবালা দেবীকে লেখা।

[৩]

ওঁ

বেলা

এতদিন পরে কাল তোমাকে কুলের আচার পাঠাতে পেরেছি। সুরেন বাড়ী ফিরে গেছে, তার কি এখন বেশী দিন থাকবার যো আছে তার শ্বাশুড়ি বলে দিয়েছেন রোজ তাঁদের বাড়ী যেতে।

আমাদের বেয়ানটি হবে ভাল, বেশী বয়েস নয়, তাছাড়া ভালমানুষ এবং বেশ ধার্ম্মিক। সুরেনের বিয়েতে যদি আমরা

যাই তাহলে তোমাকে আনাবার ইচ্ছে আছে, যদি তোমাদের না আপত্তি থাকে। নঠাকুরঝি এখনও এখানে আছেন দুচার দিনের মধ্যে যাবেন। রাণীকে তিনি লিখতে ও বাজাতে শেখাচ্ছেন। তোমার ভাশুরের অন্যত্র থাকা কি ঠিক হোল? আজ উনি খাবার পর হঠাৎ বলে উঠলেন যে "চল তোমাতে আমাতে বেলাদের একবার দেখে আসি।" ইস্কুল নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন, নিজেই পড়াতে আরম্ভ করেছেন। রথীর জন্যে একটা ভাল ঘোড়া কিনেছি, সে তাতে চড়তে বড় সাহস করে না। মিস্ পারসনস্ আমাদের কাছে কাজের জন্যে ফের উমেদারী করছে কিন্তু আমাদের স্থানাভাব তানইলে রাখা যেত। তোমাকে যে টেবিল ঢাকা দিয়েছে আমি ভুলে রেখে এসেছি, তবু তুমি একটু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখ।

অমলা : চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী অমলা দাশ
কৃতী : ভ্রাতুষ্পুত্র কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক্ষুদ্রতমা কন্যা : তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী
খোকা : জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জগন্নাথ : পুরাতন কর্মচারী
তারকবাবু : তারকনাথ পালিত
দিনু : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নগেন্দ্র : শ্যালক শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
নদিদি : স্বর্ণকুমারী দেবী
নলিনী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী
নাটোর : জগদিন্দ্রনাথ রায়
নীতু : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতাপবাবু : ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
প্রমথ : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
প্রিয়বাবু : প্রিয়নাথ সেন
ফুলতলা : খুলনায় মৃণালিনী দেবীর পিত্রালয়
বড়দিদি : সৌদামিনী দেবী
বলু : ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিপিন : কবির পুরাতন ভৃত্য
বিবি : শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
বিষ্ণু : গায়ক ও শিক্ষক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়
বিহারীবাবু : বিহারীলাল গুপ্ত
বেলা বা বেলি : জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী

মনীষা : ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

মেজবোঠান : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

যদু : খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

রথী : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রমা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

বাণী বা রেণুকা : দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা দেবী

লোকেন : লোকেন্দ্রনাথ পালিত

শরৎ : জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

সত্য : ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সরলা : ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী

সুধী : ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেন : ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুসি : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সাহানা দেবী

হেশ : চিত্রকর শশীকুমার হেশ

Mrs. Gupta : বিহারীলাল গুপ্তের পত্নী সৌদামিনী দেবী

সংশোধন

১৫ পৃ.	২০ ছত্রে	ডিক্রি
২৯ পৃ.	৩ ছত্রে	সম্রাজ্ঞী
৪০ পৃ.	৭ ছত্রে	চরে
৬১ পৃ.	১৩ ছত্রে	সাট্টাঠুট্টি
৬৭ পৃ.	১২ ছত্রে	ঠিক [সময়ে] ইত্যাদি